The Evolution of FIQH

মাযহাব

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

প্রথম বাংলা সংস্করণ

জুমাদা আস-সানি ১৪৩৫ হিজরি। এপ্রিল ২০১৪ ইংরেজি

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৭৬৭৬-৩

পরিবেশক : www. ar-raiyan.com

+৮৮ ০১৭৮১১৮৩৫০১

সিয়ান পাবলিকেশন

২৩-২, জালান অপেরা, ডি ইউ২/ডি

তামান টিটিডিআই জায়া

৪০০০০, শাহ আলাম,

সেলাংগর, মালয়শিয়া

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তাঁর জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তাঁর সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তাঁর এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশীমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না।
>
> (সহীহ্ আল-জামি' আস্-সাগীর, হাদীস্ নং ৭৬৬২)

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ নকল করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। (আল-বাকারাহ, ২:১৮৮)

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

(আল-মা'ইদাহ, ৫:৮৭)

সূচিপত্র

প্রতিবর্ণীকরণ তালিকা

আরবি হা̱র্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি হা̱র্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ
أ-ء	’	ض	দ̱
آ-ى	আ-া	ط	ত̱
ب	ব	ظ	জ̱
ت	ত	ع	‘
ة	হ/ত (পরে আরবি শব্দ থাকলে)	غ	গ
ث	স়	ف	ফ
ج	জ	ق	ক̱
ح	হ̱	ك	ক
خ	খ	ل	ল
د	দ	م	ম
ذ	য̱	ن	ন
ر	র	ه-ه	হ
ز	য	و	ও
س	স	و (স্বরচিহ্ন হিসেবে)	উ/ু
ش	শ	ي	ই
ص	স̱	ي (স্বরচিহ্ন হিসেবে)	ঈ/ী

অধস্বর ও স্বরচিহ্ন

আরবি হার্‌ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি হার্‌ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ
أو، ـَو	আও/আউ	أي، ـَي	আই/আয়
ـَ ফাতহা̱হ	া	ـّ শাদ্দাহ	দ্বিত্ব অক্ষর
ـِ কাসরাহ	ি	ـْ সুকূন	্ (হস্‌ চিহ্ন)
ـُ দা̱ম্মাহ	ু		

বি:দ্র: خ ر ص ض ط ظ غ ق এই আটটি অক্ষরের পর ফাতহা̱হ এলে উচ্চারণানুগ বানান লেখার জন্য ‘আ-কার’ বর্জন করা হয়েছে।

প্রকাশকের কথা

মাসজিদের শহর ঢাকা। যেখানে শৈশব কেটেছে সেখানে পাঁচ থেকে ছটি আযান শোনা যেত। এরপরেও আমরা সাত মিনিট হেঁটে দূরের একটি মাসজিদে যেতাম সলাতের জন্য। কারণ মাসজিদটি আমার নিজ মাযহাবের।

ছোটবেলার স্মৃতি হাতড়ে বেড়ালে তাওহীদ শব্দটি আসে না, আসে মাযহাব শব্দটা। তাওহীদের প্রকারভেদ শেখার আগে আমরা শিখেছি বিভিন্ন মাযহাবের নাম। কিন্তু তারপরও মাযহাব ব্যাপারটা খোলাসা হয়নি কোনোদিনও। কেউ বলত, "আমরা কোনো মাযহাবই মানি না।" কেউ বলত, "একটি মাযহাবই মানতে হবে।" কারো ভাষ্য ছিল, "আমরা শুধু কুর'আন-হাদীস্ মানি, বাকি সব বাদ।" এ কথা শুনে স্কুলের বন্ধু বলল, "আমরা কি তাহলে কুর'আন-হাদীস্ মানি না?"

আমাদের এলাকার আল-আমিন মাসজিদ নিয়ে মিথ ছিল—এটা শিয়াদের মাসজিদ। অথচ শিয়া মাসজিদ নামে একটা মাসজিদ ছিল কাছেই। কেউ বলত কাদিয়ানিদের মাসজিদ। আহলে হাদীস কথাটা এতই ব্রাত্য ছিল! মিছিল এসেছে মাসজিদ ভেঙে দেবে বলে এমন স্মৃতিও আছে মনে। কাছেই একটা মাসজিদের মাইক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেটাও স্মৃতিপটে আছে। অমুসলিমদের নয়, আমরা শত্রু মনে করতাম একদল মুসলিমদেরকে। তাদের শত্রুভাবাপন্নতা দেখতেও পেতাম।

তবে সমস্যাটা একতরফা ছিল না। হানাফিদের পেছনে সলাত হয় না এমন ফাতওয়া চাওয়া হতো। দেওয়াও হতো। হানাফিদের কেউ আহলে হাদীস মাসজিদে এসে পড়লে তেঁড়ে-ফুঁড়ে যাওয়া হতো। আমলের সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে হারিয়ে যেত আদাবের সুন্নাহ।

বড় হয়ে বুঝেছি, মাসজিদ ইট-বালু-সিমেন্ট-রডে তৈরি; আহলে হাদীসও নয়, হানাফিও নয়—আল্লাহর ঘর। বুঝেছি, মাযহাবকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ির এ সংঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি আমরা। বঞ্চিত থেকেছি দীনের প্রকৃত জ্ঞান থেকে। নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা,

জাতীয়তাবাদের মতো সমকালীন সমস্যাগুলোর জন্য আমরা তৈরি হইনি। মুসলিম বাংলাদেশিদের একটা বিশাল প্রজন্ম আল্লাহকে না চিনে বড় হয়েছে; জেনেছে ইসলাম মানেই কাদা ছোড়াছুড়ি।

আমরা মুসলিমরা মানুষের মাঝে সংঘাত চাই না। মানুষকে আমরা ঐক্যের দিকে ডাকি, আল্লাহর এককত্বের দিকে ডাকি। সেই আমরাই যদি মতভিন্নতাকে ঘিরে অনৈক্য আর হানাহানি সৃষ্টি করি, তবে বিচার দিবসে আমাদের জবাব দিতে হবে, শাস্তি পেতে হবে—নিশ্চিত। মাযহাবকে কেন্দ্র করে অজ্ঞতার যে বিশাল ধোঁয়াশা সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেটাকে আমরা জ্ঞানপবনে দূর করতে চাই। "*মাযহাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*" বইটি একটি পরিকল্পিত জ্ঞানবিপ্লবের অংশ।

বইটি ফিকহশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ইতিহাস এবং প্রয়োগের অনেক অজানা-আঁধারে আলোকপাত করেছে। বইটি মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড: বিখ্যাত 'আলিম এবং ইমামদের অমর কাজ এবং কার্যপদ্ধতির কথা বলেছে। ফিকহ নামক বিজ্ঞানের অকপট আলোচনাটা জানলে আমরা মাযহাব অনুসরণ বা বর্জনকেন্দ্রিক প্রান্তিকতায় যেতাম না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণেই বইটি প্রত্যেক বাঙালি মুসলিমের অবশ্যপাঠ্য।

আমাদের প্রচেষ্টা মানুষকে একতাবন্ধ করার। সে সংগ্রামে এ বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আল্লাহ যেন আমাদের প্রচেষ্টাটি কবুল করে নেন। তিনি যেন এ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের সংলগ্নতার উত্তম প্রতিদান দেন। তিনি যেন এ বইয়ের পাঠকের হৃদয় খুলে বইয়ের বক্তব্য বোঝা ও মানার তাওফিক দেন। আমীন।

শরীফ আবু হায়াত
ম্যানেজার, সিয়ান পাবলিকেশন

মুখবন্ধ

মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের আইনি বিধান বর্ণনাই হলো ইসলামি ফিক্হশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়। তাই *আল*-ফিক্হ *আল-ইসলামি* হলো মূলত ইসলামি আইনের পূর্ণাঙ্গ সংকলন। মুসলিম জীবনে তাই ফিক্হ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন যে, একটি জাতি তার সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পার্থিব উন্নতির ক্ষেত্রে যত উন্নতির সোপানেই আরোহণ করুক না কেন, যদি সে জাতির মধ্যে আইনের অনুশাসন না থাকে এবং আইনি মূলনীতি বলে কোনো জিনিস না থাকে, যা তাদের সকল আচরণ, মু'আমিলা ও চুক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে ও যার উপর ভিত্তি করে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিশৃঙ্খলা দূর করবে, তাহলে তার পতন ত্বরান্বিত হতে বাধ্য; কারণ আইনি মূলনীতির অনুসরণ ও আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি জাতিকে পুরোপুরি সমৃদ্ধ ও উন্নত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ (আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) ও তাঁদের অনুসারী ইসলামের ইমামগণ ও নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ যুগে সেটিই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

আল-ফিক্হ *আল-ইসলামি* ওয়াহ্য়ি নির্ভর একটি আইনি ব্যবস্থাপনা। আল-কুর'আন ও আস-সুন্নাহ হলো ফিক্হের মূল উৎস। এ দুটি উৎসের মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে ফিক্হশাস্ত্র যুগে যুগে উদ্ভূত সকল নতুন সমস্যারও সমাধান দিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে, ইসলামি আইন চির আধুনিক, গতিময় ও সকল যুগের সাথেই সংগতিপূর্ণ। ইসলামের অন্যান্য শাখার মতোই ইসলামি ফিক্হের রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইতিহাস। এমন সুন্দর অবদান যে-ফিক্হের, তার ইতিহাস জানার আগ্রহ ও স্পৃহা কার না রয়েছে!

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস্ রচিত "*মাযহাব : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*" শীর্ষক বইটি পাঠকদের সে আগ্রহ ও স্পৃহা মেটানোর উদ্দেশ্যেই

রচিত। যদিও এ বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকেই কম-বেশি লেখা জ্ঞানের ভুবনে আমরা পাই, তবুও এ বিষয়ে আধুনিক অনেক জিজ্ঞাসা আমাদেরকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এসব প্রশ্নের চমৎকার সন্তোষজনক জবাব আমরা এ বইটিতে পাই।

ইসলামি আইন ও ফিক্হের ধারাবাহিক বিকাশ ও বিভিন্ন যুগে ফিক্হি ইজতিহাদের ইতিহাস এতে যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি ইসলামি আইন বিষয়ক গবেষণার এ ধারাবাহিকতায় কীভাবে বিভিন্ন মত ও মাযহাবগুলো তৈরি হলো, কেন তৈরি হলো, কীভাবে ইসলামি সমাজ তা থেকে উপকৃত হলো কিংবা কখন মাযহাবি কোন্দলের বিভেদে সম্পৃক্ত হলো–সেটিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি মুসলিম স্কলার ও সাধারণ শিক্ষিত সকল মুসলিমের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোও তিনি চিহ্নিত করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে, যাতে ইতিহাসকে সামনে রেখে উম্মাহ্র ঐক্যের ব্যাপারে তারা নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে ধৈর্যের সাথে বিভেদ ও হানাহানি ত্যাগ করে আদর্শ মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে।

লেখক নিজেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, বিভিন্ন মাযহাব ও মতের অনুসারী আজকের মুসলিমগণ যদি এরকম মহৎ উপলব্ধি নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন, তাহলে বর্তমানে বিরাজমান নানা মতানৈক্য ও বিভেদ সত্ত্বেও সবাই মিলে একপ্রাণ ও এক দেহ হয়ে কাজ করা সম্ভব। এভাবে এ চমৎকার বইটি বিভেদ ও মাযহাবি কোন্দলমুক্ত পরিবেশে জ্ঞান সাধনার একটি তাত্ত্বিক রূপরেখা যেমন পেশ করেছে, তেমনি ইসলামি পরিবেশে সফল সামাজিক কাজের একটি আদর্শিক ভিত্তিও তৈরি করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি জ্ঞান সাধনার জগতে এ বইটি অত্যন্ত চমৎকার ও অতুলনীয় সংযোজন। আশা করি বইটির ক্ষুরধার বক্তব্য, প্রাঞ্জল উপস্থাপন ও ফিক্হী ইতিহাসের অনুপম বিশ্লেষণ আমাদের পাঠক সমাজে সাড়া ফেলবে। আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন এবং এর লেখককে জাযা' খাইর ও হায়াতে তাইয়েবা দান করুন।

ড. মুহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী,
হেড অফ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট,
ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর মাত্র এক বছরের কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানিতে আগের সংস্করণের সব কপি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। তবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানুষের কাছে বইটির চাহিদা যেন আরও অনেক বেড়ে গেছে। বইটির ব্যাপক চাহিদা প্রমাণ করে যে, মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ ও সুপারিশগুলো বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহর মেহেরবানিতে তা সঠিকই ছিল। তবে কেবল ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতেই একথা বলছি না; বরং পাঠকদের কাছ থেকে বইটির বিষয়বস্তুর ব্যাপারেও আমি অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। এমনকি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু পাঠক নিজ উদ্যোগে বইটির তামিল অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। উর্দু অনুবাদের কাজও এগিয়ে চলছে। ফলে, ইংরেজি ভাষার পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে আমিও বইটি পুনঃমুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রথম সংস্করণে কয়েকটি স্থানে মুদ্রণজনিত কিছু অস্পষ্টতা ছিল। তাই পুরো বইটিকে পুনরায় টাইপ করিয়েছি। প্রথম সংস্করণের তুলনায় এটিতে অধিক সতর্কতার সাথে বেশ কিছু শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ করেছি। বিষয়বস্তুকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ইংরেজি বইটির শিরোনাম *'Evolution of the Madh-habs'* থেকে পরিবর্তন করে *The Evolution of Fiqh (Islamic Law & The Madh-habs)* রেখেছি। প্রথম অধ্যায় বাদে মূল বইয়ে খুব সামান্যই পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর সেগুলোও মূলত প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধন ও পরিমার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে প্রথম পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা হয়েছে। পাদটীকাতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ইফতেখার ম্যাকিন ভাইয়ের সহায়তায় প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদগুলো থেকে বইটিতে ব্যবহৃত সব হাদীসের মূলসূত্র উল্লেখ করেছি। যেসব হাদীস সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে নেই সেগুলোর

নির্ভরযোগ্যতাও তুলে ধরেছি। মোটকথা হাদীসনির্ভর সিদ্ধান্ত নিয়ে পাঠকদের সংশয় দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। অনুরূপভাবে পরোক্ষভাবে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সূত্র পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে। উন্নত প্রচ্ছদ ডিজাইন ও বইয়ের কলেবর হ্রাসের মাধ্যমে অঙ্গসজ্জাতেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আশা করি, এগুলো বইটিকে আগের তুলনায় আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলবে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট দু'আ' করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে বরকতময় করেন। যারা এ বই থেকে সর্বাধিক উপকৃত হতে পারবে তাদের কাছে একে পৌঁছে দেন এবং কিয়ামাতের দিন এটিকে আমার ভালো কাজের পাল্লায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই বইটির মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামি আইন তথা ফিকহশাস্ত্রের গঠন ও ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে সুচ্ছভাবে তুলে ধরা, যেন বিভিন্ন মাযহাবের[১] আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট ও কারণগুলো তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী এবং মাযহাবপন্থী ও মাযহাবপন্থী নয় এমন সকল মুসলিম ভাইদের মধ্যকার ছোটখাটো মতপার্থক্যকে সহজে নিরসন করা যাবে। বইটিতে বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনার একটি তাত্ত্বিক রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। মুসলিম জাতি যেন মাযহাবকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অকারণ দলাদলি থেকে মুক্ত হয়ে, ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের লক্ষ্য পানে এগিয়ে যেতে পারে সে মহান উদ্দেশ্যে বেশ কিছু বিষয় বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলিম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই বইটি প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে একজন নওমুসলিম যে ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে বইটির প্রয়োজনীয়তা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়ার পর তার সামনে হয়তো চার মাযহাবের যেকোনো একটিকে উপস্থাপন করা হয়। তাকে এ কথাও বলা হয় যে, আরও তিনটি মাযহাব আছে এবং এই চারটি মাযহাবের প্রত্যেকটিই সঠিক।

প্রাথমিক পর্যায়ে এতে নওমুসলিম ব্যক্তির হয়তো কোনো সমস্যা হয় না। কারণ তার শিক্ষক নিজ মাযহাব অনুসারে তাকে যা শেখান, সে কেবল

---

(১) মাযহাব শব্দটির উৎপত্তি যাহাবা ক্রিয়াপদ থেকে। এর অর্থ গমন করা। আক্ষরিক অর্থে মাযহাব বলতে চলাচলের পথ বা যেকোনো পথকে বোঝায়। কোনো বিশেষ বিষয়ে কোনো বিখ্যাত 'আলিমে দীনের মতকেও তার চিন্তাধারা তথা মাযহাব নামে অভিহিত করা হতো। এ শব্দটি কোনো বিশেষজ্ঞ 'আলিমের আইনগত কিংবা দার্শনিক সমগ্র মতামত বোঝাতেও ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী সময়ে শব্দটি কেবল একক কোনো ব্যক্তির মতই নয়, বরং তার শিষ্য ও অনুসারীদের মতকে বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়।

সেগুলোই অনুসরণ করে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমদের সংস্পর্শে এলে সে বিভিন্ন মাযহাবের নিয়ম-কানুনে বেশ কিছু পার্থক্য দেখতে পায়। তখন তার শিক্ষক হয়তো তাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, চারটি মাযহাবই সঠিক। এগুলোর যেকোনো একটির অনুসরণ করলেই সে সঠিক পথে থাকবে।

কিন্তু বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে কিছু পার্থক্য নবদীক্ষিত ব্যক্তিকে একসময় ঠিকই কিছুটা ধাঁধায় ফেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বাভাবিক বুদ্ধি থেকে বোঝা যায়: কোনো ব্যক্তি একই সময়ে উদূ'সহ[২] ও উদূ'বিহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। কিন্তু কিছু বিষয়কে এক মাযহাবে উদূ' ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য করা হলেও অন্য মাযহাবে হয়তো সেটিকে উদূ' ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কীভাবে একটা কাজ একই সাথে হালাল এবং হারাম দুটোই হতে পারে? মুসলিম জাতির হারানো ঐক্য ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী সকল সচেতন মুসলিমের কাছেই এসব অসংগতি স্পষ্ট।

মাযহাবগুলোর মধ্যে এ ধরনের মতপার্থক্যপূর্ণ কিছু বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম জাতির মধ্যে দুটি প্রান্তিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে:

১. কতিপয় মুসলিম সকল মাযহাব প্রত্যাখ্যান করে দাবি তুলেছে যে, তারা কেবল কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র[৩] অনুসরণ করবে।

২. অন্যদের বক্তব্য হলো, সকল মতপার্থক্য সত্ত্বেও চারটি মাযহাবই ওয়াহ্‌য়ির বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো সকল ক্ষেত্রেই বিনা প্রশ্নে যেকোনো একটি মাযহাবের মত অনুসরণ করা।

এই উভয় সিদ্ধান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত। দ্বিতীয় মতের অনুসারীগণ উম্মাহ্‌র এই মাযহাবকেন্দ্রিক মতপার্থক্যকে এক ধরনের স্থায়ী রূপ দান করেছেন। এমন দৃষ্টিভঙ্গি অতীতে মুসলিমদের বিভক্ত করেছে এবং বর্তমানেও করে চলছে। অন্যদিকে সকল মাযহাব এবং ফিকহশাস্ত্র প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম

---

(২) শব্দটির সরল অনুবাদ হলো পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধৌতকরণ। এটি মূলত পবিত্রতা অর্জনের এক বিশেষ পদ্ধতি এবং কিছু কিছু 'ইবাদাহর পূর্বশর্ত।

(৩) নাবি ﷺ-এর জীবন পদ্ধতি। তাঁর বক্তব্য, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতির আইনগত মর্যাদা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সুন্নাহ ইসলামি আইনের দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

দলটিও এক চরমপন্থা ও বিচ্যুতির দ্বার খুলে দিচ্ছে। ফিক্‌হশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা এমন বিষয়েও সরাসরি কুর'আন ও সুন্নাহকে প্রয়োগ করতে চান যে বিষয়ে কুর'আন-হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই। নিঃসন্দেহে উভয় পরিণতিই ইসলামের বিশুদ্ধতা ও মুসলিম জাতির সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশাল প্রতিবন্ধকতা। কারণ নাবি ﷺ বলেছেন,

"সর্বোত্তম প্রজন্ম আমার প্রজন্ম এবং তারপর তার পরের প্রজন্ম।"(৪)

নাবি ﷺ-এর এই হাদীস্ থেকে স্পষ্ট যে, আমরা তাঁর প্রজন্ম থেকে যত দূরে সরে যাব, কুর'আন-সুন্নাহ্‌র সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে ও তার প্রয়োগে তত বেশি অক্ষম হয়ে পড়ব। অর্থাৎ পূর্বসূরি বিজ্ঞ 'আলিমদের সিদ্ধান্তই কুর'আন-সুন্নাহ্‌র সঠিক অর্থকে অধিকতর উপস্থাপন করে। তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোই ফিক্‌হশাস্ত্রের ভিত্তি এবং আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র ও দিকনির্দেশনা। আল্লাহর আইন অধ্যয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত উপেক্ষা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এসব আইনের সঠিক উপলব্ধি ও যথাযথ প্রয়োগের জন্য দরকার ফিক্‌হশাস্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। তাই, এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত থাকবে—মায্‌হাবগুলোর উৎপত্তি বা আত্মপ্রকাশ, ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং কিছু মাসআলায় মতপার্থক্যের নেপথ্য কারণ।

আশা করি, এ গ্রন্থ পাঠ করে চিন্তাশীল মুসলিমগণ মায্‌হাবকেন্দ্রিক মতপার্থক্যগুলোর উৎস ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন এবং এ বিষয়ে সঠিক মনোভাব পোষণ করতে সক্ষম হবেন; আল্লাহর একত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। পাশাপাশি এসব ক্ষুদ্র মতানৈক্যের কথা ভুলে ইসলামি জীবন-বিধানের মৌলিক আইন বাস্তবায়নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মনিয়োগ করবেন।

রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে "ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ" বিষয়টি পড়াতেন ড. 'আসাল। এই বিষয়ের উপর আমার ক্লাসনোট ও গবেষণাপত্রই

(৪) 'ইমরান ইব্‌ন হুসাইনের এই বর্ণনাটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারি। মুহাম্মাদ মুহসিন খান, সহীহ্ আল-বুখারি, আরবি-ইংরেজি, মাদীনাহ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬, খণ্ড ৫, পৃ. ২, হাদীস্ নং ৩।

হলো এ বইয়ের মৌলিক উপকরণ। এগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ ও পরিমার্জন করে হিজরি ১৪০০-১৪০১ (১৯৮০-৮১ ইং) সালে রিয়াদের মানারাত প্রাইভেট স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে ব্যবহার করেছি। হিজরি ১৪০২ (১৯৮২ ইং) সালে এ পাঠ্য উপকরণগুলো নিউইয়র্কের ব্রুকলিন আস-সুক বুকস্টোর *Lessons in Fiqh* শিরোনামে বই আকারে প্রকাশ করে। বর্তমানের এই গ্রন্থটি মূলত *Lessons in Fiqh* এরই একটি পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ।

ধৈর্য সহকারে পাণ্ডুলিপি টাইপ ও প্রুফরিডিংয়ের জন্য বোন জামিলা জোনসকে ধন্যবাদ। বিশেষ ধন্যবাদ আমার বাবা ব্র্যাডলি আর্লে ফিলিপ্‌সকে; তাঁর পরামর্শ ও মূল পাঠের সযত্ন সম্পাদনার জন্য।

আশা করি, ফিক্‌হশাস্ত্রের ইতিহাসের উপর রচিত এ বইটি ইসলামি জীবনধারায় মাযহাবগুলোর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে এবং এগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পাঠকদের সাহায্য করবে।

পরিশেষে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট দু'আ' করছি তিনি যেন ইসলামকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নিজ অনুগ্রহে কবুল করেন।

ওয়াস-সালামু 'আলাইকুম,
আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স

সূচনা

ফিক্‌হ ও শারী‘আহ

ফিক্‌হশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুঝতে হলে প্রথমেই ফিক্‌হ ও শারী‘আহ শব্দ দুটির অর্থ জানা প্রয়োজন। ফিক্‌হ শব্দের সরল অনুবাদ হলো ইসলামি আইন-কানুন (Islamic law)। শারী‘আহ শব্দটিরও প্রায় একই অর্থ করা হয়। তবে, আরবি ভাষাবিদ কিংবা বিশেষজ্ঞ ‘আলিম—কারও কাছেই শব্দ দুটি সমার্থক নয়।

ফিক্‌হ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো কোনো বিষয়ে সঠিক ও গভীর উপলব্ধি। নাবি ﷺ একটি হাদীসে এই অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন:

> "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের ফিক্‌হ (সঠিক উপলব্ধি) দান করেন।"(৫)

পারিভাষিকভাবে ফিক্‌হ বলতে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র বিভিন্ন প্রমাণ থেকে মাসআলা ইসতিম্বাত তথা আইন-কানুন বের করে আনার নীতিকে বোঝায়; ব্যাপক অর্থে কুর'আন সুন্নাহ্‌র আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বা আইন সমষ্টিকেও ফিক্‌হ বলা হয়। অন্যদিকে শারী‘আহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো এমন একটি পানির আধার যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রাণী পানি পান করার জন্য ভিড় করে। এর আরেকটি অর্থ হলো সরল-সঠিক পথ। যেমনটি কুর'আনে আছে,

ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(৫) মু‘আউইয়াহ ﷺ থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারি; খণ্ড ৪, পৃ. ২২৩-২২৪, হাদীস নং ৩৪৬; সহীহ্ মুসলিম ['আব্দুল হামীদ সিদ্দীকির ইংরেজি অনুবাদ, বৈরুত: দার আল-আরাবিয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৬১, হাদীস নং ৪৭২০;] তিরমিযি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও হাদীসটি সংকলন করেছেন।

তার পর আমরা তোমাকে একটি শারী'আহ্র ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব, তুমি তা অনুসরণ করো। আর যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না।

(আল-জাসিয়াহ, ৪৫:১৮)

ইসলামি পরিভাষায় এ শব্দটি দ্বারা ইসলামের সব বিধানকে বোঝায়, যা নাবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল-কুর'আন ও নাবি ﷺ-এর জীবনাদর্শ তথা সুন্নাহ্র মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে[৬]।

পার্থক্য

উল্লিখিত সংজ্ঞা দুটি থেকে নিম্নোক্ত তিনটি পার্থক্য বেরিয়ে আসে:

১. শারী'আহ হলো কুর'আন কিংবা হাদীসে উল্লিখিত সামগ্রিক বিধান। অন্যদিকে ফিক্হ হলো নির্ধারিত বিষয়ে শারী'আহ হতে উদ্ভাবিত আইনকানুন।

২. ইসলামি শারী'আহ সুনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ফিক্হের অনেক বিধান পরিবর্তিত হয়।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারী'আতে ব্যাপক ও সার্বজনীন মৌলিক নীতিগুলো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফিক্হের আইনগুলো সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ শারী'আহ্র কোনো বিধানকে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রেক্ষাপটে ঠিক কীভাবে প্রয়োগ করা হবে—তার বিস্তৃত বিবরণ হলো ফিক্হ।

(৬) মুহাম্মাদ সা'লাবি, আল মাদখাল ফিত-তা'রীফ বিল-ফিক্হ আল-ইসলামি, (বৈরুত, দার আন-নাদওয়াতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৯), পৃ. ২৮।

দ্রষ্টব্য

১. ফিক্হশাস্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের উপর লিখিত এ বইয়ে 'ইসলামি আইন' পরিভাষাটি ফিক্হি ও শার'ই—উভয় আইনকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হবে। তবে, পার্থক্য করার প্রয়োজন পড়লে ফিক্হ অথবা ফিক্হি আইন এবং শারী'আহ কিংবা শারী'আহ্‌র আইন পরিভাষাটি ব্যবহার করা হবে।

২. এ বইয়ে ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে বইয়ের শেষে; সেখানে ব্যবহৃত শব্দগুলোর বহুবচন দেওয়া হয়েছে। বহুল পরিচিত আরবি বহুবচন বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, মুসলিমূন এর পরিবর্তে মুসলিমগণ এবং সুওয়ার এর পরিবর্তে সূরাগুলো।

ফিক্হের ক্রমবিকাশ

ফিক্হের ক্রমবিকাশকে ঐতিহাসিকভাবে ছয়টি প্রধান পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। যথা: ভিত্তি, প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, বিকাশ, সুসংহতকরণ এবং বন্ধ্যাত্ব ও অবনতি। এ পর্যায়গুলো নিম্নোক্ত সময়ে সংঘটিত হয়েছে:

ক) **ভিত্তি** : নাবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নুবুওয়াতের যুগ (৬০৯-৬৩২ সাল)।

খ) **প্রতিষ্ঠা** : ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগ তথা নাবি ﷺ-এর মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে 'আলি ؓ-এর খিলাফাতের শেষ সময় পর্যন্ত, ১১-৪০ হিজরি (৬৩২-৬৬১ সাল)।

গ) **নির্মাণ** : ৪১ হিজরি (৬৬১ সাল) তথা উমাইয়া শাসনের শুরু থেকে প্রায় ১৩১ হিজরিতে (৭৪৯ সালে) এর পতন পর্যন্ত।

ঘ) **বিকাশ** :১৩১ হিজরিতে আব্বাসি রাজত্বের উত্থান থেকে শুরু করে আনুমানিক ৩৪০ হিজরিতে (প্রায় ৯৫০ সাল) এর পতনের শুরু হওয়া পর্যন্ত।

ঙ) **সুসংহতকরণ** : ৩৪০হিজরিতে 'আব্বাসি রাজত্বের অবনতি থেকে শুরু করে ৬৫৬হিজরিতে (১২৫৮ সাল) মঙ্গোলিয়োদের হাতে সর্বশেষ আব্বাসি খলীফা খুন হওয়া পর্যন্ত।

চ) **বন্ধ্যাত্ব ও অবনতি** : হিজরি ৬৫৬ সালে বাগদাদ ধ্বংস থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

এ বইটিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ উল্লিখিত পর্যায়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে। এই পর্যায়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলে পাঠকগণ প্রতিটি মাযহাবের ক্রমবিকাশ ও ফিক্হশাস্ত্রের উন্নয়ন সাধনে মাযহাবগুলোর সার্বিক অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন। এ বিষয়টিও তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, কোনো একক মাযহাবই গোটা ইসলামি আইন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরার দাবি করতে পারে না। অন্য কথায় কোনো একটি মাযহাবের মাধ্যমে ফিক্হ শাস্ত্রকে সঠিকভাবে নিরূপণ করাও সম্ভব নয়।

শারী'আহ্র ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি মাযহাবেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। স্থান-কাল ও সাংস্কৃতিক পটভূমির ভিন্নতা সত্ত্বেও যৌথভাবে শারী'আহ ও ফিক্হই পারে গোটা মুসলিম উম্মাহ্কে একতাবদ্ধ করতে। বস্তুত, যে নির্ভুল মাযহাবটি প্রশ্নাতীতভাবে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় তা হলো নাবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাযহাব। শারী'আহর ব্যাপারে একমাত্র তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ও কিয়ামাত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়। অন্য কোনো মাযহাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত নয়; বরং তা মানবীয় চেষ্টার ফল, তাই স্বাভাবিক কারণেই এগুলো মানবীয় ত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

শাফি‘ই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আশ-শাফি‘ই রহীমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে বলেছেন, “আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সব হাদীস্ সম্পর্কে জানেন; অথবা যেসব হাদীস্ শুনেছেন তার কোনটিই ভুলে যাননি। কাজেই, আমার প্রণীত আইন বা মূলনীতিতে স্বাভাবিক কারণেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীসের সাথে অসংগতিপূর্ণ কিছু থাকতেই পারে। অতএব, আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেছেন সেটাই হলো একমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আর সেটাই আমার প্রকৃত মাযহাব।”[৭]

(৭) ইমাম শাফি‘ই থেকে নির্ভরযোগ্য ইসনাদসহ এ বক্তব্যটি সংকলন করেছেন আল-হাকিম (ইবন্ ‘আসাকির, তারীখ দিমাশক্, খণ্ড ১৫, অনুচ্ছেদ ১, পৃ. ৩) এবং ইবন্ আল-কায়্যিম, ই‘লাম আল-মুকি‘ঈন, (মিশর: আল-হাজ্জ ‘আব্দুস-সালাম প্রেস, ১৯৬৮, খণ্ড ২, পৃ. ৩৬৩)।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পর্যায়: ভিত্তি

ফিকহশাস্ত্র ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ের ব্যাপ্তি হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুরো নুবুওয়াত কাল (৬০৯–৬৩২ সাল) জুড়ে। এ সময়ে ইসলামি আইনের একমাত্র উৎস ছিল ওয়াহয়ি; অর্থাৎ কুর'আন ও সুন্নাহ। কুর'আনে আছে ইসলামি জীবন পদ্ধতির মূল নীতি, আর নাবি ﷺ-এর প্রাত্যহিক জীবন হলো সেই নীতিগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি।[১]

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

৬০৯ সনে নাবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নুবুওয়াতের শুরু থেকে ১১ হিজরিতে (৬৩২ সাল) তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ বছর ধরে কুর'আনের আয়াতগুলো পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ও তাঁর সাহাবিগণ মাক্কা ও মাদীনায় যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতেন সেগুলোর সমাধানে কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হতো। কুর'আনের কিছু আয়াতে মুসলিম ও অমুসলিমদের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া হয়েছে। এরকম আয়াতের অনেকগুলো শুরু হয়েছে "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে"—এ ধরনের বাচন ভঙ্গি দিয়ে। যেমন,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ... ﴿٢١٧﴾

"তারা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও: এ মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বিরত

(১) আল-মাদখাল, পৃ. ৫০।

রাখা, আল্লাহকে অবিশ্বাস করা, মাসজিদ আল-হারামে যেতে বাধা দেওয়া এবং হারামের অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বেশি গর্হিত কাজ..." (আল-বাকারাহ, ২:২১৭)

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا... ﴿٢١٩﴾

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, ঐ দুটির মধ্যে অনেক বড় ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও মানুষের জন্য তাতে কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু তার উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা অনেক বেশি...।"

(আল-বাকারাহ, ২:২১৯)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ... ﴿٢٢٢﴾

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঋতুস্রাব সম্পর্কে। বলে দাও, সেটি একটি কষ্টদায়ক (অশুচিকর) অবস্থা। অতএব এ সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো...।

(আল-বাকারাহ, ২:২২২)

নাবি ﷺ-এর যুগে সংঘটিত বিশেষ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুর'আনের বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। সাহাবি হিলাল ইবন উমাইয়ার ঘটনাটি এমনই একটি উদাহরণ। তিনি নাবি ﷺ-এর কাছে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। নাবি ﷺ তখন তাকে বলেন,

"তোমাকে প্রমাণ (অর্থাৎ আরও তিনজন সাক্ষী) আনতে হবে, নতুবা তোমাকে (অপবাদ আরোপের) নির্দিষ্ট শাস্তি (আশিটি বেত্রাঘাত) ভোগ করতে হবে।"

হিলাল رضي الله عنه বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আমাদের কেউ যদি অন্য পুরুষকে তার স্ত্রীর উপর দেখে তাহলে কি সে সাক্ষী খুঁজতে যাবে?'

কিন্তু নাবি ﷺ প্রমাণ আনার দাবিরই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এরপর জিবরীল عليه السلام নিম্নোক্ত ওয়াহয়ি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন[২]।

(২) সহীহ বুখারি, খণ্ড ৬, পৃ. ২৪৫–২৪৬, হাদীস নং ২৭১।

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

“আর যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে (ব্যভিচারের) অভিযোগ দায়ের করে; অথচ তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী নেই, তাদের ব্যাপারে বিধান হলো, তাদের একজনের সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, সে চার বার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আর স্ত্রীর উপর থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়ে থাকে।’

(আন-নূর, ২৪:৬–৯)

সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। এর অধিকাংশ বিষয় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বা কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাবি ﷺ-এর বিভিন্ন বক্তব্য। যেমন একবার একজন সাহাবি নাবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

> “হে আল্লাহর রসূল, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। সে সময় মিঠা পানি দিয়ে উদু’ (অজু) করলে আমাদের তৃষ্ণার্ত থাকতে হবে। আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উদু’ করতে পারব?” তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, “সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত জীবগুলো হালাল।” (৩)

এ বিষয়টি উল্লেখ্য যে, ওয়াহ্‌য়ির যুগে একটি আইন একবারে আরোপ না করে কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামপূর্ব সময়ে লাগামহীন স্বাধীনতায় অভ্যস্ত সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী আরবদের জন্য এ

(৩) তিরমিযি, নাসা’ই, ইব্‌ন মাজাহ এবং সুনান আবি দাউদ, শাইখ আল-আলবানি এ হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যায়িত করেছেন; সহীহ্ সুনান আবি দাউদ, (বৈরুত, আল- মাকতাব আল-ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮), খণ্ড ১, পৃ. ১৯, হাদীস্ নং ৭৬।

পদ্ধতিটি ছিল সহজে গ্রহণযোগ্য। আইনের নেপথ্য কারণ ও প্রসঙ্গ জানা থাকায় তার তাৎপর্য উপলব্ধি ও তা বাস্তবায়ন করা তাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক এ প্রক্রিয়াটি শুধু সামগ্রিক আইনি কাঠামোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নির্দিষ্ট অনেক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে। এর একটি উত্তম উদাহরণ হলো সলাত।

মাক্কি জীবনের প্রাথমিক যুগে সলাত ছিল দিনে দুবার: সকালে ও সন্ধ্যায়।[৪] মাদীনায় হিজরাতের কিছুদিন আগে দৈনিক পাঁচ বার সলাত ফরজ করা হয়। তখন মাগরিব বাদে অন্যান্য সময়ের ফার্দ (ফরজ) সলাত ছিল দুই রক'আত। মাগরিব সলাত ছিল তিন রক'আত। মুসলিমরা সলাতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর মাগরিব ও ফাজ্‌র বাদে অন্যান্য ওয়াক্তের সলাত বাড়িয়ে করা হয় চার রক'আত।[৫] তবে পরবর্তীকালে ভ্রমণকারীর জন্য চার রক'আত বিশিষ্ট সকল ফার্দ সলাতকে কমিয়ে দুই রক'আত করে আদায়ের বিধান দেওয়া হয়।

কুর'আনের সাধারণ বিষয়বস্তু

মাক্কায় মুসলিমগণ ছিল নির্যাতিত সংখ্যালঘু। অন্যদিকে মাদীনায় হিজরাত করার পর তারা সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী এবং শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন। অবস্থার এই পরিবর্তনের ফলে কুর'আনিক আইনের ধরন প্রকৃতির মধ্যেও এমন কিছু বৈচিত্র্য আসে যার ফলে দুটি স্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান হয়।

মাক্কি যুগ (৬০৯–৬২২ সাল)

এ যুগের শুরু মাক্কায় নুবুওয়াতের সূচনা থেকে, আর সমাপ্তি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় নাবি ﷺ-এর হিজরতের মধ্য দিয়ে। এ যুগের ওয়াহ্‌য়ির মূল

(৪) আল-মাদখাল, পৃ. ৭৪–৭৮।
(৫) সহীহ্ বুখারি, খণ্ড ১, পৃ. ২১৪, হাদীস্ নং ৩৪৬।

প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি নির্মাণ, যেন নবদীক্ষিত সাহাবিদেরকে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কঠিন কাজের জন্য প্রস্তুত করা যায়। মাক্কায় অবতীর্ণ ওয়াহ্যির আলোচ্য বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের মূল তত্ত্বগুলোকেই কোনো না কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে। নিচে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো:

ক) তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব

প্রাচীন কাল থেকেই মাক্কার লোকেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত। তবে একই সাথে তারা কিছু দেবতাকে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার অথবা মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও বিশ্বাস করত। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে নির্মূল করতে এ সময়ের ওয়াহ্যির বাণীতে আল্লাহ ﷻ-র একত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া কেউ ভালো-মন্দ কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

খ) আল্লাহর অস্তিত্ব

মাক্কার কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। তাই আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে ওয়াহ্যির মাধ্যমে কিছু অকাট্য যুক্তি তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

গ) পরকাল

পরকাল সম্পর্কে জানার কোনো মাধ্যম মানুষের কাছে নেই, তাই মাক্কি যুগের ওয়াহ্যিতে পরকালের বিস্ময়, রহস্য ও বিভীষিকাগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ) ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন জনগোষ্ঠী

বেশ কিছু মাক্কি আয়াতেই 'আদ ও সামূদ জাতির মতো ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার কারণেই তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এসব আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম অমান্যকারীদের সতর্ক করা হয়েছে এবং ঈমানদারদের কাছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

ঙ) সলাত

সলাত ও তাওহীদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই মাক্কি যুগে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে কেবল সলাতকেই তাওহীদের সাথে ফার্দ করা হয়েছে।

চ) চ্যালেঞ্জ

কুর'আন কোনো সাধারণ বই নয়, বরং এটি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক মহান গ্রন্থ। অন্য যেকোনো গ্রন্থ থেকে এটি একেবারেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অনন্য ও অতুলনীয় এক গ্রন্থ। মাক্কার মুশরিকদের সামনে এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য কিছু আয়াতে আরববাসীকে এর অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে।[৬]

মাদানি যুগ: ১-১১ হিজরি (৬২২-৬৩২ সাল)

হিজরাতের মাধ্যমে এ যুগের সূচনা। আর এ যুগের সমাপ্তি ঘটে ১১ হিজরিতে (৬৩২ সাল) নাবি ﷺ-এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে। মাদীনায় ইসলামের প্রসার লাভের পর নাবি ﷺ সেখানে হিজরাত করেন এবং মাদীনার শাসক নিযুক্ত হন এবং মুসলিম জনগোষ্ঠী পরিণত হয় একটি উদীয়মান রাষ্ট্র শক্তিতে। এ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ ওয়াহ্য়ির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রটিকে সুসংহত করা। আর এ সময়েই ইসলামি শারী'আহর সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইনের সিংহভাগ অবতীর্ণ হয়। মাক্কি যুগে ঈমান ও তাওহীদের যে-মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল মাদানি যুগের ওয়াহ্য়ির মাধ্যমে সেসবের ভিত্তি আরও মজবুত করা হয়েছিল। তবে মাদীনায় অবতীর্ণ ওয়াহ্য়ির নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়বস্তুর বেশিরভাগ এমন সব আইনের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, যা একটি ইসলামি রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের জন্য অপরিহার্য।

---

(৬) আল-মাদখাল, পৃ. ৫১–৫৫।

ক) বিধিবিধান

মাদানি যুগেই ইসলামের অন্য তিনটি ভিত্তি অর্থাৎ যাকাত, সওম (রোজা) ও হাজ্জকে ওয়াহ্য়ির মাধ্যমে ফার্দ করা হয়। নিষিদ্ধ করা হয় নেশাজাতীয় দ্রব্য, শুকর ও জুয়া। এ সময়েই ব্যভিচার, হত্যাকাণ্ড ও চুরির শাস্তি নির্ধারণ করা হয়।

খ) জিহাদ

মাক্কি যুগে অত্যাচারী মাক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিলো কাফিরদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করা এবং তাদের ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি করা। মাদীনায় যখন মুসলিমদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার ও এ সম্পর্কিত আইনকানুন অবতীর্ণ হয়।

গ) আহলুল-কিতাব

মাদীনাতেই মুসলিমদের সর্বপ্রথম ইহুদিদের সংস্পর্শে আসতে হয় এবং খ্রিস্টানদের সাথেও ব্যাপক মেলামেশা হয়। ইহুদিরা নাবি ﷺ-কে উত্যক্ত ও ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অমূলক প্রশ্নের উত্থাপন করত। মাদানি যুগের বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। অন্য কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সাথে রাজনৈতিক সন্ধি স্থাপন ও তাদের সতী নারীদের বিয়ের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

ঘ) মুনাফিক

ইসলামের বিজয় সুপ্রসন্ন দেখে এই প্রথমবারের মতো কিছু লোক মন থেকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল। ইসলামকে ভেতর থেকে ধ্বংস করাই ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। মাদীনায় মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী, তাই সেসব মুনাফিক প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করতে পারছিল না। আবার কিছু লোক ঈমানদারদের ঈমানি চেতনাকে দুর্বল করে দেওয়ার হীন

উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে ঈমান আনার পরক্ষণেই তা আবার ত্যাগ করত। মাদানি যুগের কিছু আয়াতে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে এদের ব্যাপারে ঈমানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অন্য কিছু আয়াতের মাধ্যমে ধর্মত্যাগী-মুরতাদদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন করা হয়।[৭]

কুর'আনের আলোচ্য বিষয়

কুর'আনের আলোচ্য বিষয়কে তিনটি সাধারণ শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে:

১. আল্লাহ ﷻ, মালা'ইকাহ্ (ফেরেশতা), ঐশী গ্রন্থ, নাবি-রসূল ও পরকালের সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস। এ সকল বিষয় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে আকীদাহ্ নামে পরিচিত শাখার আওতাভুক্ত।

২. উন্নত চরিত্রের বিকাশ, আচার-ব্যবহার, নৈতিক মূল্যবোধ ও আত্মিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে নির্দেশিত বিষয়গুলো। এই বিষয়গুলো ইসলামি জ্ঞানের জগতে 'ইল্ম আল-আখলাক্ বা নৈতিক জ্ঞানবিষয়ক শাখার অন্তর্ভুক্ত।

৩. মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত বিধিবিধান। এগুলোতে রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও অন্যান্য বেশ কিছু ঐচ্ছিক বিষয়। জ্ঞানের এ শাখাটি ইসলামি আইনশাস্ত্র তথা বিভিন্ন বিধিবিধানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে।[৮]

(৭) মান্না' আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী 'উলূম আল-কুর'আন, (রিয়াদ, মাকতাব আল-মা'আরিফ, অষ্টম মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃ. ৬৩–৬৪ ও আল-মাদখাল, পৃ. ৫৫–৫৭।

(৮) মুহাম্মাদ আল-খুদারী বেক, তারীখ তাশরী' আল-ইসলামি, কায়রো, আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, ১৯৬০, পৃ. ১৭–১৮।

কুর'আনে আলোচিত আইনসংক্রান্ত বিষয়

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে অবতীর্ণ আইনকানুনগুলো মূলত মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া বিধিবিধান। এধরনের বিধিবিধানগুলোকে দুটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা যায়:

১. হাক্কুল্লাহ বা মানুষের উপর মহান আল্লাহর অধিকারসংক্রান্ত বিষয়। সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা 'ইবাদাতই আল্লাহর প্রাপ্য এসব অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলোর মধ্যে কিছু 'ইবাদাত রয়েছে এমন, যেগুলোর সঙ্গে অন্য মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই; যেমন: সলাত ও সিয়াম। আবার কিছু 'ইবাদাত রয়েছে এমন যার সাথে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয় জড়িত; যেমন: যাকাত। আবার কিছু 'ইবাদাত রয়েছে এমন যেগুলোর সাথে সামাজিক ও শারীরিক সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান, যেমন: হাজ্জ। ঈমানের পর এ চারটি 'ইবাদাতই হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ।

২. মানুষের উপর মানুষের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়। এ ধরনের আইনগুলোকে বিষয়বস্তুর বিবেচনায় চারটি উপভাগে ভাগ করা যায়:

ক. ইসলামের সুরক্ষা ও প্রচার-প্রসার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আইন। এতে রয়েছে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জিহাদের বিধিবিধানগুলো।

খ. পরিবার গঠন ও তা সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আইন। এর মধ্যে রয়েছে বিয়ে, তলাক ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন।

গ. ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, যার মধ্যে রয়েছে লেনদেন ও বিভিন্ন চুক্তিনামা সম্পাদনসংক্রান্ত নিয়মনীতি ইত্যাদি।

ঘ. ফৌজদারি আইন; যার অধীনে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, চুক্তি, ভাড়াসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে আইন ভঙ্গ করে সংগঠিত অপরাধের শাস্তি বিষয়ক বিধিবিধান।[৯]

(৯) তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামি, পৃ. ৩৪–৩৫।

কুর'আনে আইন প্রণয়নের ভিত্তি

স্বয়ং কুর'আনেই বলা হয়েছে যে, এ গ্রন্থ অবতীর্ণের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির চিন্তা-চেতনা, আদর্শ-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্কার সাধন। প্রাক-ইসলামি যুগের সকল আচারপ্রথাকে ইসলাম নির্বিচারে বাতিল ঘোষণা করেনি, বরং কেবল মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর সকল বিকৃত প্রথা ও কুসংস্কারগুলোকেই বাতিল করেছে। যেমন, ইসলামি আইন সুদি কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ, এ শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিত্তবানরা সমাজের অসহায় মানুষের দুর্বলতাকে পুঁজি করে প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ে তোলে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত এসব কুপ্রথার আরেকটি হলো ব্যভিচার। এ অনাচার নারী নির্যাতন ও পারিবারিক বন্ধন ধ্বংসের প্রধান কারণ। তাই ইসলাম এই জঘন্য অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্যক্তি ও সমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করে বলে নেশা জাতীয় দ্রব্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিকে ব্যবসার ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। সকল প্রকার প্রতারণামূলক ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করে ব্যবসাসংক্রান্ত আইন-কানুনের ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। বিয়েশাদির প্রচলিত ব্যবস্থাকেও সংস্কার করা হয়েছে। ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ কিছু পদ্ধতিকে বহাল রেখে বাকিগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ এসব প্রথাগুলো ছিল মূলত বিয়ের নামে ব্যভিচার কিংবা তার মতোই কিছু প্রক্রিয়া। ত়লাক় প্রদানের নিয়মকে নীতিগতভাবে যদিও ইসলামে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; তবে তার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে অনেকটা পরিমার্জিত করা হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম কখনোই মানব সভ্যতা, নৈতিকতা ও আচার প্রথাকে বিশেষ কোনো শত্রুতামূলক মনোভাব নিয়ে ধ্বংস করতে আসেনি। তাই নতুন সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলাম সব কিছুকে দেখেছে মানব কল্যাণের মহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলাম সব সময়ই ক্ষতিকর আচার প্রথা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেছে এবং কল্যাণকর নিয়মনীতিগুলো বহাল রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেন:

...يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ... ﴿١٥٧﴾

“এটা তাদের সৎকাজের আদেশ দেয়, আর অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। কল্যাণকর জিনিসগুলোকে হালাল ও ক্ষতিকর জিনিসগুলোকে হারাম করে।”

(আল-আ'রাফ ৭: ১৫৭)

নীতিগতভাবেই ইসলাম একটি গঠনমূলক জীবনব্যবস্থা; ধ্বংসাত্মক নয়। এর লক্ষ্যই হচ্ছে কেবল সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠন; নিছক নিয়ন্ত্রণ ও শাসন নয়। তবে জেনে রাখা দরকার যে, ইসলামি জীবনব্যবস্থায় আরবের কিছু প্রথাকে বহাল রাখার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম তার আইন-কানুন ও মূলনীতিগুলো অন্য কোনো উৎস থেকে ধার করেছে। আবার এমন ধারণা করাও উচিত নয় যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আইন ও বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। সমাজে প্রচলিত নিয়মনীতির যা কিছু ইসলাম সমর্থন করেছে তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলেই মনে করতে হবে। কারণ:

ক) আল্লাহ ﷻ পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবি-রসূলের উপরই কিছু না কিছু 'ইবাদাত ও বিধি-বিধান আরোপ করেছিলেন। সেগুলোরই কিছু কিছু নিয়মনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে আরবরা লাভ করেছে। এর একটি উত্তম উদাহরণ হলো হাজ্জ। এটি চালু করেছিলেন নাবি ইবরাহীম ﷺ ও ইসমা'ঈল ﷺ।

খ) ইসলামের মূলনীতিগুলো মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক নয়; এতে অযৌক্তিক কিছুই নেই। এগুলো বরং মানবীয় বিচারবুদ্ধিকে অযৌক্তিকতার হাত থেকে রক্ষা করে। তাই ইসলামি আইনে মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত ভালো কাজগুলোকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

গ) ইসলাম সমাজের প্রচলিত যেসব কল্যাণকর প্রথাকে বহাল রেখেছে, সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য। অনুমোদিত প্রথাগুলো যদি তৎকালীন সমাজে আগে থেকে না-ও থাকত, তবে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই ইসলাম হয়তো সেগুলোকে নতুন করেই চালু করত।

তবে বহাল রাখা প্রথার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাতিলকৃত প্রথার চেয়ে অনেক কম। অধিকন্তু, এগুলোকে হুবহু আগের আকৃতিতে বহাল রাখা হয়নি, কেবল ভিত্তিটুকুই অবিকৃত রয়ে গিয়েছে।[১০]

ইসলামি শারী'আহ সংস্কারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কতগুলো আইনগত বিধিনিষেধ জারি করেছে, যেগুলো মুসলিম জাতির সামাজিক আচরণবিধির নৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলে। তবে, মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি মৌলিক নীতিকে বিবেচনায় রেখেছে।

১. কাঠিন্য দূরীকরণ

ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানুষের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়। এ দিকনির্দেশনার উদ্দেশ্য হলো মানুষের জন্য এমন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ন্যায়নিষ্ঠ জীবন যাপন করতে পারবে। কারও উপরে তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কখনোই ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্য ধর্মের মতো আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে ইসলাম মানুষের উপর কোনো কঠোরতা চাপিয়ে দেয়নি। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনগুলো পূরণ করা। অনুরূপভাবে, ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়গুলো থেকে সকল অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা দূর করা হয়েছে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন কঠোরতা দূর করে তাদের জীবনযাত্রা সহজ সাবলীল করার নীতি ছড়িয়ে আছে গোটা কুর'আন জুড়েই।

কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এর অল্প কয়েকটি উদাহরণ:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ... ﴿٢٨٦﴾

(১০) আল-মাদখাল, পৃ. ৫৭-৫৯

"আল্লাহ ﷻ কারও ওপরই তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপান না।"
(আল-বাক়ারাহ, ২:২৮৬)

﴿...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

"আল্লাহ ﷻ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের কষ্ট দিতে চান না।"
(আল-বাক়ারাহ, ২:১৮৫)

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।"
(আল-হ়াজ্জ, ২২:৭৮)

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

"আল্লাহ ﷻ তোমাদের ওপর থেকে (বিধি-নিষেধ) হালকা করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (আন-নিসা' ৪:২৮)

এসব নীতির কারণে আল্লাহ ﷻ মানুষের জন্য বিভিন্ন ছাড় দিয়েছেন; যেমন, সফরের সময় স়িয়াম না রাখা, চার রকা'আত বিশিষ্ট ফার্দ় স়লাত দুই রকা'আত করে এবং জুহ্র-'আস়্র ও মাগরিব-'ইশাকে মিলিয়ে আদায় করার অনুমতি। অধিকন্তু, তীব্র প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তু (যেমন শূকরের গোশত ও অ্যালকোহল ইত্যাদি) গ্রহণের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।

﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"তবে যদি কোন ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় (হ়ারাম খেতে) বাধ্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" (আল-মা'ইদাহ, ৫:৩)

নাবি ﷺ ছিলেন ইসলামি আইনগুলো বাস্তব প্রয়োগের সর্বোত্তম উদাহরণ। বর্ণিত আছে যে, যখনই তাঁর সামনে দুটি বৈধ পন্থা খোলা থাকত তখন

তিনি সব সময়ই অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থাটিকে বেছে নিতেন।[১১] আরেকটি ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, কিছু সাহাবিকে ইয়েমেনে পাঠানোর প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন,

"(লোকদের জন্য) বিভিন্ন বিষয় সহজ করে দিয়ো, কঠিন করে দিয়ো না।"[১২]

ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞগণ সকলেই বলেছেন যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দয়াময় আল্লাহ ﷻ মানুষের দুর্বলতার দিকটি বিবেচনায় রেখেই তাদের উপর থেকে কাঠিন্য দূরীকরণের এই নীতিটি অনুসরণ করেছেন। বাস্তব জীবনে ইসলামি বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ইসলামি আইনবিদগণ এই মূলনীতির ভিত্তিতে বেশ কিছু ইজতিহাদি নীতি নির্ধারণ করছেন।[১৩]

২. বিধিনিষেধের সংখ্যা হ্রাস

উল্লিখিত কাঠিন্য দূরীকরণের মূলনীতির সাথে সংগতি রেখেই ইসলামে আরোপিত শার'ই বিধিনিষেধের সংখ্যা খুবই সীমিত রাখা হয়েছে। প্রত্যক্ষ নিষিদ্ধ কাজ বা হারাম ঘোষিত বস্তুর সংখ্যা ইসলামি আইনে খুবই অল্প। কুর'আনে হালাল-হারাম নির্ধারণের পদ্ধতির উপর একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ নীতির পরিষ্কার প্রতিফলন দেখা যায়। নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা দেওয়া হয়েছে, অথচ অনুমোদিত বস্তুর সংখ্যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই; তাই কোনো তালিকা উল্লেখ না করে এগুলোর ক্ষেত্রে একটি সাধারণ অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে সব নারীর সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

---

(১১) 'আ'ইশাহ থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারি, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ৭৬০; মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ.১২৪৬, হাদীস নং ৫৭৫২ এবং আবু দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১৩৪১, হাদীস নং ৪৭৬৭।

(১২) আবু বুরদাহ ؓ থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারি, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৪১-৪৪৩, হাদীস নং ৬৩০; ও মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৪৪, হাদীস নং ৪২৯৮। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি আবু মূসা (হাদীস নং ৪২৯৭) এবং আনাস ইবন মালিক ؓ (হাদীস নং ৪৩০০) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

(১৩) তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামি, পৃ. ১৯–২০। আল-মাদখাল, পৃ. ৮৫–৮৯।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ ﴿٢٣﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু ...।"
(আন-নিসা', ৪:২৩)

বিয়ে করা নিষিদ্ধদের এ তালিকা দেওয়ার পর আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ

"এরা ছাড়া তোমাদের সম্পদ দিয়ে (মোহর আদায় করে) অন্য যেকোনো নারীকে এই শর্তে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ করবে, অবাধ যৌন লালসা তৃপ্ত করবে না।" (আন-নিসা', ৪:২৪)

আবার নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তুরও একটি বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুর'আন বলছে,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ

"তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাইকৃত পশু এবং নিঃশ্বাস বুদ্ধ হয়ে মরে যাওয়া পশু...।" (আল-মা'ইদাহ, ৫:৩)

অন্যদিকে হালাল খাদ্যের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴿٥﴾

"আজ তোমাদের জন্য সকল কল্যাণকর বস্তুকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আহলুল-কিতাবিদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।' (আল-মা'ইদাহ, ৫:৫)

অধিকন্তু, নিষিদ্ধ বস্তুর সংখ্যা খুবই অল্প হওয়া সত্ত্বেও নিরুপায় ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করে তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। এর উদাহরণ

ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এ অব্যাহতির কথা আল্লাহ ﷻ কুর'আনের বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ:

﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾

"অবশ্য যে-লোক নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না-হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ ﷻ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (আল-বাকারাহ, ২:১৭৩)

মহান দয়াময় আল্লাহ ﷻ কুর'আন অনুসরণে আগ্রহী মানুষদের জন্য কোনো কঠোরতা সৃষ্টি করতে চাননি। তাই কুর'আনে সামগ্রিক আইনগুলোর খুব বেশি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ দেওয়া হয়নি। কুর'আনের বেশ কিছু আয়াতে এ মূলনীতির ইঙ্গিত রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতটি এগুলোর অন্যতম,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

"তোমরা যারা বিশ্বাস করো, এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। কুর'আন নাযিলের সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া হবে; আল্লাহ তা থেকে মাফ করুন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল।" (আল-মা'ইদাহ, ৫:১০১)

এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো কারও প্রশ্নের কারণে আল্লাহ ﷻ আবশ্যক করে দিয়েছেন। অথচ তারা যদি প্রশ্ন উত্থাপন না করত, তাহলে হয়তো আল্লাহ ﷻ সেই বিষয়টিকে ঐচ্ছিক হিসেবে রেখে দিতেন। উপরোক্ত আয়াতটিতে মানুষের জন্য কঠোরতা আরোপ করতে পারে এমন কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতেই নিষেধ করা হয়েছে। একবার সাহাবিদের কেউ কেউ হাজ্জ প্রতি বছর ফার্দ কি না—এ মর্মে নাবি ﷺ-কে প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

অবশেষে তাঁর জবাব থেকে এ ধরনের প্রশ্ন করার উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিই ফুটে ওঠে।[১৪] তিনি ﷺ তখন বলেন,

> "আমি যদি বলতাম, হ্যাঁ—তাহলে তা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। আমি যেসব বিষয়ে তোমাদের কোনো নির্দেশনা দিইনি সেসব বিষয়ে তোমরা আমাকে কোনো প্রশ্ন কোরো না। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন এবং নাবিদের সাথে যুক্তিতর্ক ও মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।"[১৫]

আরেকটি বর্ণনায় নাবি ﷺ বলেন,

> "আমি যদি কোনো কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করি, তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো। আর আমি যে বিষয়ের নির্দেশ দিই তা তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করো।"[১৬]

তিনি ﷺ আরও বলেন,

> "মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারাই সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ করেছে যারা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, যা ইতিপূর্বে বৈধ থাকা সত্ত্বেও কেবল তাদের প্রশ্নের কারণেই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[১৭]

ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত কুর'আনিক আইনগুলো হলো মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহ ﷻ-র সহজীকরণ নীতির আরেকটি উত্তম উদাহরণ। মানুষের জন্য জটিলতা তৈরি করতে পারে এমন কোনো বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বর্ণনা এসব আয়াতে দেওয়া হয়নি; বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য কিছু সাধারণ মূলনীতি দেওয়া হয়েছে। যেমন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ ﴿١﴾

---

(১৪) তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামি, পৃ. ২০–২১।

(১৫) আবু হুরায়রা বর্ণিত উক্ত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৬৭৫, হাদীস নং ৩০৯৫।

(১৬) আবু হুরায়রা বর্ণিত উক্ত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১২৫৬–১২৫৭, হাদীস নং ৫৮১৮।

(১৭) 'আমর ইবন সা'দ বর্ণিত উক্ত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১২৫৭, হাদীস নং ৫৮২১।

"তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ, তোমাদের অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করো।"

(আল-মা'ইদাহ ৫:১)

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴿٢٧٥﴾

"আল্লাহ ﷻ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।"

(আল-বাকারাহ, ২:২৭৫)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

"তোমরা যারা বিশ্বাস করো, পারস্পারিক সম্মতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" (আন-নিসা', ৪:২৯)

৩. জনকল্যাণ নিশ্চিত করা

কিয়ামাত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে সকলের জন্য প্রেরিত নাবি রসূলুল্লাহ ﷺ। বিশ্ববাসীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ কুর'আনে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আর আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি; কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা বোঝে না।" (সাবা', ৩৪: ২৮)

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ...﴿١٥٨﴾

"বলে দাও: হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি..." (আল-আ'রাফ ৭:১৫৮)

নাস্‌খ (রহিতকরণ)

আইন প্রণয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নাস্‌খ বা রহিতকরণের নীতি থেকেও মানব কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখার বিষয়টি সুস্পস্ট। আল্লাহ ﷻ বিশেষ সময়ের জন্য বা বিশেষ কোনো উদ্দ্যেশ্যে সাময়িক কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন। উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পূর্বের সাময়িক আইনটির প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে যায়। ফলে আইনটিকে রহিত ঘোষণা করা হয়েছে। কুর'আন ও সুন্নাহ্‌য় বেশ কিছু মানসূখ বা রহিত আইনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এগুলোর কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।[১৮]

উত্তরাধিকার (ওয়াসিয়্যাত)

প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কেবল তার সন্তান-সন্ততিরাই লাভ করত। সুনির্দিষ্ট কোনো ওয়াসিয়্যাত থাকলেই কেবল মৃতের পিতা-মাতা সম্পত্তিতে ভাগ পেতেন।[১৯] তাই ইসলামের শুরুর দিকে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ওয়াসিয়্যাত করাকে আল্লাহ ﷻ বাধ্যতামূলক করে দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পদে পরিবার-পরিজনের সকলের অধিকারকে নতুন গড়ে ওঠা মুসলিম সমাজের সামনে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তাহলে পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে ওয়াসিয়্যাত

---

(১৮) আল-মাদখাল, পৃ. ৮৯–৯০।

(১৯) দেখুন বুখারি, (আরবি-ইংরেজি) খণ্ড ৪, পৃ. ৬, হাদীস্ নং ১০।

করে যাওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যারা আল্লাহর ব্যাপারে সদাসচেতন তাদের জন্য এ নির্দেশ জরুরি।" (আল-বাকারাহ, ২:১৮০)

মুসলিম সমাজ যখন স্বেচ্ছায় এ আইন মেনে নিয়ে যথাযথভাবে তা প্রয়োগ করতে শুরু করে তখন আল্লাহ ﷻ আইনটিকে পরিষ্কারভাবে বিবৃত উত্তরাধিকার আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেন। পুরাতন আইনটি রহিতকরণ প্রসঙ্গে নাবি ﷺ বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ প্রত্যেকের অধিকার সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই এখন থেকে উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো ওয়াসিয়্যাত করা যাবে না।"[২০]

শোক পালনের মেয়াদ

ইসলামের শুরুর দিকে স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রী'র জন্য শোক পালনের নির্ধারিত মেয়াদ ছিল এক বছর। এ পূর্ণ সময়ের জন্য ওয়াসিয়্যাত-এর মাধ্যমে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে যাওয়া স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক ছিল।

এ প্রসঙ্গে কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের স্ত্রীদের জীবিত রেখে মারা যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদের এক বছর পর্যন্ত ঘর থেকে বের না করে দেওয়ার এবং সেই এক বছরের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্য মৃত্যুর পূর্বে ওয়াসিয়্যাত করে যায়। তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় তাহলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে তারা যা কিছুই করুক না কেন তার কোনো দায়-দায়িত্ব

---

(২০) আবু উমামাহ বর্ণিত উক্ত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম আবু দাউদ, খণ্ড ২, পৃ. ৮০৮, হাদীস নং ২৮৬৪; তিরমিযি, নাসা'ই, ইবন মাজাহ ও আহমাদ। শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ সুনান আবি দাউদ, গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলেছেন।

তোমাদের ওপর নেই। আল্লাহ ﷻ সবার ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাশালী এবং প্রজ্ঞাময়।' (আল-বাক়ারাহ, ২:২৪০)

এরপর শোক পালনের মেয়াদ কমিয়ে চার মাস দশ দিন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুর'আনে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের স্ত্রীদের রেখে মারা যায় সে স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন নিজেদের (বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। তারপর তাদের ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা চায় করতে পারে, তোমাদের ওপর এর কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ ﷻ তোমাদের সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" (আল-বাক়ারাহ, ২: ২৩৪)

পূর্বের বিধানে স্ত্রীর জন্য ওয়াসিয়্যাত করে যাওয়া যদিও বাধ্যতামূলক ছিল পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারের আয়াতের মাধ্যমে এই বিধানকে বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি কুর'আনিক আইনেই স্বামীর সম্পদে বিধবা স্ত্রীর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, সন্তান-সন্ততি না থাকলে সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ এবং সন্তান-সন্ততি থাকলে এক-অষ্টমাংশ।

ব্যভিচার

প্রথমদিকে সকল ধরনের ব্যভিচার, সমকামিতা ও এমন যৌন অপরাধের শাস্তি ছিল ঘরে বন্দি করে রাখা যতক্ষণ না তারা অনুতপ্ত হয় এবং নিজেদের পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন,

وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّـهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

“তোমাদের নারীদের মধ্যে থেকে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু আসে অথবা আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা দুজন[২১] এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ ﷻ মহান তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল।’ (আন-নিসা’ ৪: ১৫–১৬)

পরবর্তী সময়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুনির্দিষ্ট বিধানের মাধ্যমে উপরোক্ত আইনটিকে রহিত করা হয়।

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

‘ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী প্রত্যেককে এক শ বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ﷻ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো। আর তাদের শাস্তি দেওয়ার সময় মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।’ (আন-নূর, ২৪:০২)

---

(২১) এ আয়াতের অনুবাদ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদক অনুবাদ করেছেন:

ক) যদি তোমাদের দুজন অপরাধী হয়...

খ) তোমাদের মধ্যে যে-দুজন উক্ত অপরাধ করেছে...

গ) আর যে দুজন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে এ অপরাধ সংঘটিত করেছে...

আয়াতে ব্যবহৃত ‘দু’ শব্দের অনিবার্য অর্থ এ নয় যে, উভয়কে একই লিঙ্গের অধিকারী হতে হবে। (IIPH)

নাবি ﷺ বিবাহিত ব্যভিচারীর[২২] জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যা ও সমকামিতার জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিকে কার্যকর করেছেন। অবশ্য সমকামিতার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কোনো বিশেষ পদ্ধতি তিনি নির্ধারণ করেননি।[২৩]

রহিত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনোটি পূর্বের আইনের চেয়ে আরও কঠোর আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে; যেমন ব্যভিচারীর শাস্তির আইনটি। এক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করে রাখার শাস্তিকে পরিবর্তন করে বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনোটি অপেক্ষাকৃত সহজ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে; যেমন বিধবার শোক পালনের মেয়াদ। আবার কোনোটিকে পূর্বের আইনের সমমানের, কিন্তু অধিকতর উপযোগী আইনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সবগুলো ক্ষেত্রেই রহিত আইনটি ছিল পূর্ববর্তী সময় ও পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত। অবস্থার পরিবর্তনের পর নতুন আইন জারি করা হয়েছে। রহিত আইনগুলোকে কেবল তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বিবেচনায়ই প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সার্বজনীন স্থায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সাময়িক সেই বিধানের মধ্যে কী প্রজ্ঞা নিহিত ছিল।

প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় না আনা হলে রহিতকারী আইনটি হয়তো প্রথমেই জারি করা হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিধবা মহিলার প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা যাক। প্রথমদিকে তার উপর বাধ্যতামূলক ছিল পুরো এক বছর তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করে শোক পালন করা। এ সময়ে সে বিয়ে করতে পারত না। তখন আরব সমাজে এমন কুপ্রথা চালু ছিল যে, তারা বিধবাদের আটকে রেখে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিয়েতে বাধা দিতো। এর মেয়াদ এক বছর থেকে অনেক সময় গোটা জীবনব্যাপীও

(২২) ‘উবাদাহ ইব্‌ন আস্‌-সামিত ও ইব্‌ন ‘আব্বাস বর্ণিত উক্ত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম খণ্ড ৩, পৃ. ৯১১, হাদীস্‌ নং ৪১৯২ ও পৃ. ৯১২, হাদীস্‌ নং ৪১৯৪।

(২৩) ইব্‌ন ‘আব্বাস বর্ণিত উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৪৫, হাদীস্‌ নং ৪৪৭। শাইখ আলবানি এটিকে সহীহ্‌ বলেছেন।

হতো। অবরুদ্ধ সময়ে তাদের সবচেয়ে খারাপ পোষাক পরিধান করতে বাধ্য করা হতো।[২৪]

এরূপ সামাজিক অবস্থায় শুরুতেই যদি ইদ্দাতের সময়কে কমিয়ে চার মাস দশ দিন করা হতো ও বিধবার নিজ সিদ্ধান্তে গৃহ পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হতো, তাহলে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য তা মেনে নেওয়া হতো কঠিন। তাই প্রথমে শোক পালনের মেয়াদ এক বছর নির্ধারণ করা হলো। পাশাপাশি বাতিল করা হলো আটকে রাখার প্রথা, আর বাধ্যতামূলক করা হলো ভরণপোষণ। এ পরিবর্তন মেনে নেওয়া ও এর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পরপরই শোকের সময়কালকে কমিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়।

ন্যূনতম বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে এটা অনুধাবন করা কঠিন নয় যে, রহিতকরণের এ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবীয় অবস্থার বিবেচনা ও তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা। নাবি ﷺ-এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে নুবুওয়াত যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাই এরপর আর ইসলামি শারী'আহ্‌র কোনো বিধান রহিতকরণের কোনো অবকাশ নেই।[২৫]

নুবুওয়াত যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সব সময়ই মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। কেননা, নুবুওয়াত যুগেও ইসলামি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

কুর'আনের অনেক আয়াতেই আইন প্রণয়নের সাথে সাথে তার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেগুলোর কিছু উদাহরণ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

(২৪) যায়নাব বিন্‌ত সালামাহ বর্ণিত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারি, খণ্ড ৭, পৃ. ১৯০-১৯২, হাদীস্ নং ২৫১।

(২৫) আল-মাদখাল, পৃ. ৯০-৯৩।

"তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ, তোমাদের ওপর সিয়াম পালন ফার্দ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফার্দ করা হয়েছিল। এতে আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।" (আল-বাকারাহ, ২:১৮৩)

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا... ﴿١٠٣﴾﴾

"তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে কিছু সাদাকাহ গ্রহণ করো, তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র করো এবং তাদের পরিশুদ্ধ করো।" (আত-তাওবাহ, ৯:১০৩)

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সলাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তবুও তোমরা কি এসব থেকে বিরত হবে না?" (আল-মা'ইদাহ, ৫:৯১)

নাবি ﷺ কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রায়ই তার নেপথ্য কারণটি উল্লেখ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবর জিয়ারাত করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে নাবি ﷺ বলেছেন,

> "আমি তোমাদের কবর জিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম। তবে, আমাকে আমার মায়ের কবর জিয়ারাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরাও মৃত ব্যক্তিদের কবর জিয়ারাত করতে পারো, কারণ তা পরকালের জীবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"(২৬)

আইন প্রণয়নের নেপথ্য কারণের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, কোনো আইনের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে তা প্রণয়নের কারণটি বিদ্যমান থাকা বা না-থাকার উপর। যে কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল তা যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে আইনটিও বহাল থাকবে। অবস্থার

(২৬) আবু হুরায়রা ও বুরায়দাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬৩-৪৬৪, হাদীস নং ২১৩০-২১৩১ এবং তিরমিযি।

পরিবর্তনের ফলে যখন আইনটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় তখন নতুন আইনের দ্বারা এটিকে প্রতিস্থাপন করা হয়। কারণ, এ অবস্থায় সে আইনের আর কোনো সার্থকতা থাকে না।

অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে নাবি ﷺ যাকাতের একটি অংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। তবে উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতেই 'উমার ইব্‌ন আল-খাত্‌ত্বাব ؓ তা স্থগিত করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এ সিদ্ধান্তের নেপথ্য কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, উৎসাহ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা তখনই ছিল যখন ইসলাম উত্থানের পর্যায়ে ও সমর্থনের মুখাপেক্ষী ছিল। যেহেতু তাঁর শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল তাই তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানব সমাজের প্রয়োজন ও কল্যাণ বিবেচনায় রাখার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বয়ং এর প্রণয়ন পদ্ধতির মধ্যেই। সময় কিংবা অবস্থার পরিবর্তনে সব আইনের কার্যকারিতা ও তার অন্তর্নিহিত কল্যাণ আবার হারিয়ে যায় না। এ ধরনের সার্বজনীন ও চিরস্থায়ী আইনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ পরিষ্কারভাবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও 'ইবাদাহ, বিয়ে, তলাক় ও উত্তরাধিকারসংক্রান্ত পারিবারিক আইন, খুন, ব্যভিচার, চুরি ও অপবাদ আরোপ—এগুলোর উপকারিতা কিংবা ক্ষতি কোনোটিই যুগের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। তাই এ ধরনের বিষয়ে যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা চিরন্তন ও সার্বজনীন। আবার, স্থান ও কালের পরিবর্তনে অনেক আইনের ফলাফল পরিবর্তন হতে পারে। এ সকল বিষয়ে আল্লাহ ﷻ সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন—যা মানব সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সমকালীন শাসকবৃন্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। এ ধরনের আইনের দৃষ্টান্ত রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক অবকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনগুলোর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

"তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ, আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর তাদের—যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল।" (আন-নিসা', ৪:৫৯)

নাবি ﷺ বলেছেন,

"কোনো পঙ্গু আবসিনিয়ান দাসকেও যদি তোমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করে, তাহলে তোমাদের উচিত তার কথা শোনা ও তার (নির্দেশের) আনুগত্য করা।"[২৭]

ইসলামে ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর সামগ্রিক কল্যাণকে এবং ছোট ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি প্রতিরোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আইন প্রণয়নের এ নীতিতেও মানবীয় প্রয়োজন বিবেচনায় রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৮]

এ মূলনীতির একটি উত্তম উদাহরণ হলো ইসলামে বহুবিবাহের অনুমোদন। ইসলাম এক সাথে সর্বোচ্চ চার জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে এবং তাদের প্রতি স্বামীর দায়-দায়িত্বগুলোকেও উল্লেখ করে দিয়েছে। একাধিক স্ত্রী রাখার বিষয়টি অধিকাংশ মহিলার জন্য বেদনাদায়ক। তবে আইনের মাধ্যমে যেসব দেশে বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে সকল দেশের লোকদের চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে নজর দিলে বহুবিবাহের বৈধতার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। তাই, নারী-পুরুষ উভয়ের সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে ইসলাম সীমিত পরিসরে বহুবিবাহের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিগত ভালো লাগার উপরে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। [২৯]

---

(২৭) ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হুসাইন বর্ণিত হাদীসটি সংকলন করেছেন ইমাম মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১, হাদীস্ নং ১০২১।

(২৮) আল-মাদখাল, পৃ. ৯৩-৯৫।

(২৯) বিষয়টির আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন Plural Marriage in Islam, (রিয়াদ: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ১–৯।

৪. সার্বজনীন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামি আইন সকল মানুষের জন্যই সমান। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের উপরই দায়িত্ব হলো ওয়াহ্‌য়ির আইনের সামনে আত্মসমর্পণ করা। আবার তা লঙ্ঘনের শাস্তিও সবার জন্য প্রযোজ্য। কুর'আনে উল্লিখিত আইনগুলো সার্বজনীন, অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণি বা গোত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখা টানা হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ

"আল্লাহ ন্যায়নীতির হুকুম দেন..." (আন-নাহ্‌ল, ১৬:৯০)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাবতীয় আমানাত যার প্রাপ্য তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদ্‌ল ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো।' (আন-নিসা' ৪:৫৮)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ, আল্লাহর জন্য সাক্ষী হিসেবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাও। কোনো গোষ্ঠীর শত্রুতা তোমাদের যেন এমন উত্তেজিত না-করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাবে। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো; এটি আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন।" (আল-মা'ইদাহ, ৫:৮)

আল্লাহর রসূলের যুগে মাখযূম নামক প্রভাবশালী গোত্রের এক মহিলা কিছু অলংকার চুরি করেছিল। বিষয়টি নাবি ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করা

হলে মহিলাটি দোষ স্বীকার করে। তার গোত্রের লোকেরা চাচ্ছিল না যে, কুর'আনের শাস্তির লজ্জা তার উপর পড়ুক। এজন্য তারা নাবি ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ সহাবি উসামাহ ইব্‌ন যাইদকে শাস্তি লঘু করার জন্য সুপারিশ করতে বলল। উসামাহ নাবি ﷺ এর কাছে এ সুপারিশ করলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন,

> "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছ? তারপর তিনি লোকদের একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কারণ তাদের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ চুরি করলে তারা ছেড়ে দিত, আর দুর্বল লোকেরা চুরি করলে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ! আমার নিজ কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"(৩০)

ইসলামি আইনের উৎস

আল্লাহর রসূলের সময়ে ইসলামি আইনের উৎস ছিল ওয়াহয়ি; অর্থাৎ কুর'আন ও সুন্নাহ। সুন্নাহ হলো নাবি ﷺ এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতিতে সংঘটিত যেসব বিষয়কে তিনি নিষেধ করেননি। সুন্নাহ হলো ওয়াহয়ির দ্বিতীয় ধরন। কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকেও এ বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"তিনি নিজের খেয়ালখুশী মতো কোনো কথা বলেন না। যা তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয় তা ওয়াহয়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।" (আন-নাজ্‌ম, ৫৩:৩-৪)

নাবি ﷺ কে মানবজাতির নিকট আল্লাহ ﷻ তা'আলার চূড়ান্ত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

---

(৩০) 'আ'ইশাহ বর্ণিত উক্ত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম বুখারি, মুসলিম খণ্ড ৩, পৃ. ৯০৯-৯১০, হাদীস নং ৪১৮৭ ও সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১২১৮, হাদীস নং ৪৩৬০।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ... ﴿٦٧﴾

"হে রসূল! তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।" (আল-মা'ইদাহ, ৫:৬৭)

একই সাথে মানুষের সামনে আল্লাহর চূড়ান্ত বার্তাকে ব্যাখ্যা করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিল।

... وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"...এ বাণী তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি লোকদের কাছে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে; এবং লোকেরা (নিজেরাও) যেন চিন্তা-ভাবনা করে।" (আন-নাহ্ল, ১৬:৪৪)

নাবি ﷺ কখনো বক্তব্যের মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, আবার কখনো ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর কাজের মাধ্যমে। কখনো কথা ও কাজ—উভয়ের মাধ্যমেও। যেমন, কুর'আনে মুসলিমদের সলাত কায়েম করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, অথচ তা কীভাবে আদায় করতে হবে—কুর'আন তা বিস্তারিত বর্ণনা করেনি। অতঃপর, নাবি ﷺ তাঁর অনুসারীদের সামনে সলাত আদায় করে বলেন,

> "আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছ, তোমরা সেভাবে সলাত আদায় করো।"[(৩১)]

অন্য একটি ঘটনায় এসেছে, নাবি ﷺ সলাত আদায়কালে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম দিলেন। জবাবে তিনি ডান হাত তুলে সাড়া দিলেন।[(৩২)] তাঁর স্ত্রী 'আ'ইশাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, সাজদাহ করার সময়

(৩১) বুখারি, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং ৬০৪।

(৩২) সুনান আবি দাউদ,, খণ্ড ১, পৃ. ২৩৬, হাদীস নং ৯২৭। শাইখ আলবানি সহীহ সুনান আবি দাউদ, গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নাবি ﷺ তাঁর পায়ের গোড়ালিগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন।[৩৩] অন্য আরেকটি ঘটনায়, নাবি ﷺ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইব্‌ন মাস'ঊদ তখন সলাতে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখেছিলেন। তা দেখে নাবি ﷺ ইব্‌ন মাসউদের ডান হাতটিকে উঠিয়ে বাম হাতের উপর রেখে দিলেন।[৩৪] তিনি আরও বলেছেন,

> "সাজদাহ করার সময় তোমাদের উটের ন্যায় বসা উচিত নয়। বরং (মাটিতে) হাঁটু রাখার আগে হাত রাখা উচিত।"[৩৫]

সুতরাং সুন্নাহ হলো কুর'আনের ব্যাখ্যা। কুর'আনের সাধারণ নির্দেশাবলির ব্যাখ্যা এবং এর আয়াতের সুনির্দিষ্ট অর্থকে সুন্নাহ্‌তে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে দেখা যাবে যে, সুন্নাহ্‌র সবকিছুকেই কুর'আনেও নির্দেশ করা হয়েছে; কখনো সরাসরি, আবার কোথাও আকার-ইঙ্গিতে। কুর'আনের কোনো কোনো আয়াতে এত ব্যাপক অর্থে এই নির্দেশ এসেছে যে, গোটা সুন্নাহই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন কুর'আনে বলা হয়েছে,

﴿...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟... ﴿٧﴾﴾

"রসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (আল-হাশ্‌র, ৫৯:৭)

অনেক সময় আইনটি কুর'আনে সাধারণভাবে উল্লেখ থাকে, কিন্তু এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকে সুন্নাহতে। অতএব, সুন্নাহতে থাকে আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি, নেপথ্য কারণ, শর্তাবলি এবং প্রয়োগের স্থান ও পাত্র অথবা

---

(৩৩) হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন বায়হাকি, আল-হাকিম ও ইব্‌ন খুযায়মাহ। মুসতাফা আল-আ'যামি সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ (বৈরুত, আল মাকতাব আল-ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং ৬৫৪) গ্রন্থে ও শাইখ আলবানি সিফাহ সলাত আন-নাবি, (বৈরুত, আল মাকতাব আল-ইসলামি, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ১০৯) গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(৩৪) সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং ৭৫৪। শাইখ আলবানি হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহ সুনান আবু দাঊদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং ৬৮৬।

(৩৫) সুনান আবি দাঊদ,, খণ্ড ১, পৃ. ২১৫, হাদীস নং ৮৩৯। শাইখ আলবানি সহীহ সুনান আবি দাঊদ, গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এমন অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যা সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 'অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ' এর একটি দৃষ্টান্ত হলো নিষিদ্ধ খাবারের তালিকা। কুর'আনে যেসব খাদ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার বাইরেও আরও কিছু খাদ্য হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নাবি মুহাম্মাদ ﷺ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿...وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ... ﴿١٥٧﴾

"তিনি তাদের জন্য কল্যাণকর ও পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল এবং অকল্যাণকর ও অপবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম করেন।" (আল-আ'রাফ, ৭:১৫৭)

আনাস ইব্ন মালিক ﷺ বলেন,

"খাইবার যুদ্ধের সময় একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসে বললেন, "হে রসূলুল্লাহ, গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে।" তারপর, আরেকজন এসে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! গাধাগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে।" তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আবু তলহাকে পাঠালেন এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে, "আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূল তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা খাওয়াকে নিষেধ করেছেন। কারণ তা খারাপ (এবং অপবিত্র)।"(৩৬)

অনেক ক্ষেত্রে কুর'আনের আয়াতে বর্ণিত থাকে সাধারণ মূলনীতি। সেখান থেকে নাবি ﷺ খুঁটিনাটি বিধিবিধান বের করে এনেছেন। এগুলো সঠিক হলে আল্লাহ ﷻ সত্যায়ন করেছেন, অন্যথায় সংশোধন করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, কুর'আন থেকে বের করে আনা নাবি ﷺ-এর সঠিক সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো একইসাথে খালা-বোন/ঝি কিংবা ফুফু-ভাতিজিকে বিয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ। আল্লাহ ﷻ মা ও মেয়েকে অথবা একই সাথে দুবোনকে বিয়ে করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এরপর তিনি বলছেন,

... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ

(৩৬) মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৭২, হাদীস নং ৪৭৭৮।

"এদের ছাড়া বাদবাকি সমস্ত মহিলাকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ..." (আন-নিসা' ৪:২৪)

তবে আবু হুরায়রাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

> "তোমাদের কেউ যেন কোনো মহিলাকে এবং তার ফুফু কিংবা খালাকে একসাথে বিয়ে না করে।"(৩৭)

মা ও মেয়েকে অথবা একসাথে দুবোনকে বিয়ে করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের নেপথ্য কারণ খালা-বোন ঝি কিংবা ফুফু-ভাতিজিকে একসাথে বিয়ে করার মধ্যেও বিদ্যমান। সম্ভবত এ কারণে নাবি ﷺ কুর'আনের আলোকে এই বিধান দিয়েছেন। কারণ, তিনি এ বিধান জারি করার পর এ কথাও বলেছেন যে, "তোমরা এরূপ করলে পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাবে।"

এই বক্তব্য থেকে নাবি ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন যে, দুই বোন অথবা মা-মেয়েকে একসাথে বিয়ে করলে একাধিক স্ত্রীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে যেভাবে তাদের পবিত্র সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ঠিক তেমনি কোনো খালা-বোন ঝি কিংবা ফুফু-ভাতিজিকে একসাথে বিয়ে করলে তাদের মধ্যকার পারিবারিক সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নাবি ﷺ-এর যে সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহ ﷻ সংশোধন করে দিয়েছেন তার মধ্যে জিহার তলাক অন্যতম। খাওলাহ বিনত সা'লাবাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

> "আমার স্বামী আওস ইবন আস-সামিত একদিন আমাকে বলেন, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মতো।" ফলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য আমি আল্লাহর রসূলের কাছে গেলাম। তবে, আল্লাহর রসূল ﷺ আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, "সে তোমার চাচাত ভাই, তুমি আল্লাহকে ভয় করো।" কিন্তু আমি অভিযোগ অব্যাহত রাখি। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

---

(৩৭) বুখারি, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৪, হাদীস নং ৪৫; মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৭০৯-৭১০, হাদীস নং ৩২৬৮; ও সুনান আবি দাউদ,, খণ্ড ২, পৃ. ৫৫১, হাদীস নং ২০৬১।

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ...﴿٢﴾

"আল্লাহ ﷻ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি-মিনতি করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ ﷻ তোমাদের দুজনের কথা শুনছেন; তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। এসব লোক অতি অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথাই বলে থাকে।" (আল-মুজাদালাহ, ৫৮:১–২)[৩৮]

নাবি ﷺ মনে করেছিলেন, তলাকের একটি বৈধ পদ্ধতি জিহার। তিনি খাওলাহ্‌কেও তা মেনে নিতে বলছিলেন। কিন্তু, আল্লাহ ﷻ তা অবৈধ ঘোষণা করেন।

নাবি ﷺ এর নিজের পক্ষ থেকে দেওয়া এমন কিছু মতামতও রয়েছে যেগুলোকে আল্লাহ ﷻ শার'ই বিধান হিসেবে অনুমোদন দেননি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সুন্নাহ কেবল দীনি বিধিবিধানের সাথেই সম্পৃক্ত। নাবি ﷺ তাঁর যেসব ব্যক্তিগত অভ্যাস ও আচার-আচরণ তাঁর সহাবিদের অনুসরণের নির্দেশ দেননি—তা দীনি সুন্নাহ্‌র আওতা বহির্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, রাফি' ইব্‌ন খাদীজ رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ মাদীনায় এসে লোকদের খেজুর গাছে পরাগায়ন করতে দেখে তিনি এর কারণ জানতে চান। তারা বললেন যে, এভাবে কৃত্রিম উপায়ে তারা গাছে পরাগায়ন করছেন। এরপর তিনি বললেন, "সম্ভবত এটা না করলেই ভালো হতো।"

তারা সে কাজ ছেড়ে দিলে সে বছর খেজুরের ফলন অনেক কমে গেল। নাবি ﷺ কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন,

---

(৩৮) সুনান আবি দাউদ,, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯৮, হাদীস্‌ নং ২২০৮। শাইখ আলবানি হাদীস্‌টিকে সহীহ্‌ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; সহীহ্‌ সুনান আবি দাউদ,, খণ্ড ২, পৃ. ৪১৭-৪১৮।

"আমি একজন মানুষ। তাই দীনের ব্যাপারে আমি যদি তোমাদের কিছু করতে বলি, তোমরা তা মেনে চলো। তবে, আমি যদি কোনো কিছু ব্যক্তিগত মত থেকে বলি, তাহলে মনে রাখবে আমিও একজন মানুষ।"

আনাস ﷺ বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ আরও বলেন,

"পার্থিব ব্যাপারে তোমাদেরই জ্ঞান বেশি।"(৩৯)

নাবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের আরও বলেছেন যে, তাঁর কাছে যে সকল অভিযোগ দায়ের করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রেও তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ, কোনো কোনো ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগত মতামত অনুযায়ী রায় দিয়ে থাকেন। উম্ম সালামাহ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"আমি কেবল একজন মানুষ। আর তোমরা আমার নিকট তোমাদের বিচার নিয়ে আসো। হতে পারে তোমাদের কেউ কেউ তার দাবি উপস্থাপনে অপরের তুলনায় অধিক বাগ্মী। আর আমি তাদের কাছ থেকে যা শুনি তার ভিত্তিতেই রায় দিয়ে থাকি। অতএব, আমি যদি কারো পক্ষে এমন কিছুর রায় দিয়ে দিই যা মূলত তার ভাইয়ের পাওনা, তাহলে সেটি তার না নেওয়া উচিত। কারণ, আমি তাকে কেবল জাহান্নামের একটি টুকরাই দিয়েছি।"(৪০)

ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ভিত্তিতে প্রদত্ত এসব সিদ্ধান্ত নাবি ﷺ এর সাহাবিদেরকে শারী'আহ বাস্তবায়ন পদ্ধতির একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা এটাও শিখেছেন যে, মানবীয় সাধ্যের অতীত কোনো কারণে অনিচ্ছাকৃত ভুল রায়ের জন্য কোনো বিচারককে দায়ী করা যায় না। এ বিষয়টির উপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করে নাবি ﷺ বলেছেন,

---

(৩৯) রাফি' ইব্ন খাদীজ ও আনাস বর্ণিত উক্ত হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১২৫৯, হাদীস নং ৫৮৩১-৫৮৩২।

(৪০) সুনান আবি দাউদ,, খণ্ড ৩, পৃ. ১০১৬, হাদীস নং ৩৫৭৬। শাইখ আলবানি এ হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

"কোনো ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলে তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার; আর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে একটি পুরস্কার।"(৪১)

তবে, এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"বিচারক তিন শ্রেণির; এর মধ্যে এক শ্রেণি জান্নাতে আর দুই শ্রেণি জাহান্নামে যাবে। জান্নাতবাসী শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হলো এরা সত্যকে জেনে সে অনুযায়ী ফায়সালা করে। আর যে ব্যক্তি সত্যকে জেনে অন্যায় রায় দেবে সে হবে জাহান্নামি। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই মানুষের জন্য ফায়সালা করে দিবে সেও জাহান্নামি।"(৪২)

আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানে দক্ষতা অর্জনের জন্য নাবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের সিদ্ধান্ত প্রদানে উৎসাহিত করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তাঁর ইন্তেকালের পর তারা শারী'আহ্‌র যথাযথ বাস্তবায়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারেন।

'আলি ইব্‌ন আবি তালিব رضي الله عنه বলেছেন,

"আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন; অথচ আমার বয়স কম। তাছাড়া বিচার ফায়সালা করার অভিজ্ঞতাও আমার নেই।' তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ ﷻ তোমার অন্তরকে দিকনির্দেশনা দেবেন এবং তোমার জিহ্বাকে (সত্যের উপর) সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন বাদী-বিবাদী দুজন তোমার সামনে বসবে, তখন তুমি উভয় পক্ষের বক্তব্য ভালোমতো না শুনে কোনো

(৪১) 'আম্‌র ইব্‌ন আল-'আস্ বর্ণিত উক্ত হাদীস্‌টি সংকলন করেছেন ইমাম বুখারি, খণ্ড ৯, পৃ. ৩৩০, হাদীস্ নং ৪৫০ ও সুনান আবি দাউদ,, খণ্ড ৩, পৃ. ১০১৩-১০১৪, হাদীস্ নং ৩৫৬৭।

(৪২) বুরায়দাহ বর্ণিত হাদীস্‌টি সংগ্রহ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১০১৩, হাদীস্ নং ৩৫৬৬। শাইখ আলবানি সাহীহ্ সুনান আবি দাউদ, গ্রন্থে এ হাদীস্‌টিকে সহীহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সিদ্ধান্ত দেবে না। কারণ, বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া সঠিক রায় প্রদানের জন্য অধিক সহায়ক।"(৪৩)

আবু সা'ঈদ আল-খুদরি ﷺ বর্ণনা করেছেন,

"কুরায়জাহ গোত্র এ শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিল যে, সা'দ ইবন্ মু'আয তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন। গাধার পিঠে চড়ে সা'দ মাসজিদ আন-নাবাউইর কাছে এলে আল্লাহর রসূল ﷺ মাদীনার মুসলিম আনসারদের বললেন, "তোমাদের নেতাকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়াও।" তারপর তিনি সা'দকে বললেন, "তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে—এই শর্তে লোকগুলো আত্মসমর্পণ করেছে।" সা'দ ﷺ বললেন, "তাদের যুদ্ধক্ষম সকল পুরুষকে হত্যা করা হোক, আর তাদের নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করা হোক।" এ কথা শুনে নাবি ﷺ বললেন, 'তুমি আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী বিচার করেছ।"(৪৪)

শার'ই মূলনীতির আলোকে সমকালীন নানা সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত ও তাতে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়ার নাম ইজতিহাদ। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি আইনের ক্রমবিকাশের এ পর্যায়ে নাবি ﷺ নিজে ও তাঁর সহাবিগণও ইজতিহাদ চর্চা করেছেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, নাবি ﷺ-এর ইজতিহাদগুলো আইনের কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয়। কারণ, এগুলোর বৈধতা নির্ভর করত অনুমোদনসূচক ঐশী প্রত্যাদেশের ওপর। অতএব, নাবি ﷺ-এর ইজতিহাদগুলো ছিল মূলত সহাবিদেরকে ইজতিহাদের সঠিক পদ্ধতি শেখানোর মাধ্যম। আর এ পর্যায়ে সহাবিদের ইজতিহাদগুলো ছিল মূলত এক ধরনের অনুশীলন।

(৪৩) সুনান আবি দাউদ,, খণ্ড ৩, পৃ. ১০১৬, হাদীস্ নং ৩৫৭৬। শাইখ আলবানি সহীহ্ সুনান আবি দাউদ, গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
(৪৪) মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৬৬, হাদীস্ নং ৪৩৬৮।

অধ্যায় সারাংশ

১. প্রাথমিক যুগের ইসলামি আইন ছিল মূলত শারী'আহ আইনের সমষ্টি। এগুলো ওয়াহ্য়ি আকারে অবতীর্ণ হয়ে কুর'আন ও সুন্নাহতে সংরক্ষিত ছিল। এ সকল আইনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের ভিত্তি তথা ঈমান ও উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক বিধিবিধানসংক্রান্ত।

২. কুর'আনে আইন প্রণয়নের ভিত্তি ছিল মানব জাতির সংস্কার সাধন। এ উদ্দেশ্যে মানব জাতির জন্য প্রচলিত কল্যাণকর প্রথাগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামিক আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. সংস্কারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুর'আনিক আইনে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

৩.ক. কাঠিন্য দূরীকরণ
৩.খ. বিধিবিধানের সংখ্যা হ্রাস
৩.গ. জনকল্যাণ নিশ্চিত করা
৩.ঘ. সার্বজনীন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. এ যুগেই ফিক্হশাস্ত্র ক্রমবিকাশের সূচনা হয়। নাবি ﷺ নিজে কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে আইনি সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে এই শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

৫. নাবি ﷺ নিজে সাহাবিদেরকে ইজতিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আর এভাবে এ যুগেই গঠিত হয়েছিল প্রথম মাযহাবটি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়: প্রতিষ্ঠা

এ পর্যায়টি হলো ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা[১] ও বিশিষ্ট সাহাবিদের যুগ। এ যুগের বিস্তৃতি ১১ হিজরিতে (৬৩২ সাল) আবু বাক্‌র ﷺ-এর খিলাফাতের শুরু থেকে ৪০ হিজরিতে (৬৬১ সাল) চতুর্থ খলীফা 'আলি ﷺ-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত। এ পর্যায়ের প্রথম বিশ বছরে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছিল। এ সময়েই সিরিয়া, জর্দান, মিশর, ইরাক ও পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে মুসলিম জাতি সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনধারা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের সংস্পর্শে আসে। এবং নতুন নতুন এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় যেগুলোর জন্য শারী'আহ্‌তে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না। অসংখ্য নতুন সমস্যা মোকাবিলার জন্য ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা ঐকমত্য (ইজমা') ও ইজতিহাদের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতেন। মাদীনায় নাবি ﷺ-এর হিজরাতের পর সাহাবিগণ তাঁর কাছে এই প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। ইজমা' ও ইজতিহাদের প্রয়োগের লক্ষ্যে ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা বেশ কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এগুলোই ইসলামি আইন তথা ফিক্‌হশাস্ত্রের ভিত্তিতে পরিণত হয়।

এ অধ্যায়ে ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সাহাবির কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়মনীতিকে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। এ বিষয়টিও দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, কী কারণে এ যুগটি পরবর্তী সময়ের দৃশ্যমান

---

(১) ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা আবু বাক্‌র, 'উমার, উসমান ও 'আলি ﷺ ছিলেন শেষ নাবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠতম চারজন সাহাবি। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম রাষ্ট্রকে এঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

দলাদলি থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত ছিল। এ যুগের ফিক্‌হশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোকেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়ের ফিক্‌হশাস্ত্র কঠোরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এবং এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল পরবর্তী যুগের ফিক্‌হশাস্ত্র থেকে একেবারেই ভিন্ন।

সমস্যা সমাধানে ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার পদ্ধতি

ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা কোনো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলে তা নিরসনের জন্য সাধারণত নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতেন:

১. প্রথমে তাঁরা কুর'আনে সমস্যাটির সুনির্দিষ্ট সামাধান খুঁজতেন।

২. কুর'আনে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান খুঁজে না পেলে, তার পর তাঁরা সুন্নাহতে অনুসন্ধান করতেন।

৩. সুন্নাহ্‌তেও সমাধান না পাওয়া গেলে তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবিদের বৈঠক ডেকে সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন। সাহাবিদের এ ধরনের ঐকমত্যকে ইজমা' নামে অভিহিত করা হতো।

৪. মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলে তাঁরা অধিকাংশ সাহাবির সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেন।

৫. তবে, ব্যাপক মতপার্থক্যের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত নিরূপণ কঠিন হয়ে পড়ত, তখন খলীফা নিজেই ইজতিহাদ করতেন এবং তা আইনে পরিণত হতো। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, খলীফা কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেওয়ার অধিকার রাখতেন।[২]

(২) আল-মাদখাল, পৃ. ১০৭।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহাবিদের ইজতিহাদ

খলীফাদের সাথে প্রধান সহাবিদের বৈঠকের পাশাপাশি সহাবিদের প্রায় প্রতিদিনই ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত দিতে বলা হতো। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

প্রথমত, সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে সহাবিগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলে নিতেন যে, কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সিদ্ধান্ত দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও তাঁদের দেওয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণ সঠিক না-ও হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মোহরানা নির্ধারণ করা হয়নি এমন মহিলার স্বামী মারা গেলে স্বামীর সম্পদে তার প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে একবার ইব্‌ন মাস'ঊদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে আমি আমার সিদ্ধান্ত প্রদান করছি। সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর ভুল হলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।"(৩)

দ্বিতীয়ত, যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিষয়ে সহাবিদের মধ্যে মতপার্থক্য থেকে যেত। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে যদি তাঁরা নাবি ﷺ-এর সহীহ্ হাদীস্ জানতে পারতেন, তাহলে সব মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে সাথে সাথে তা মেনে নিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাবি ﷺ-এর ইন্তেকালের পর

---

(৩) সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ২, পৃ. ৫৬৭, হাদীস্ নং ২১১১। হাদীস্‌টি আরও সংকলন করেছেন ইমাম তিরমিযি ও ইমাম নাসা'ই। শাইখ আলবানি এ হাদীস্‌টিকে সহীহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; সহীহ্ সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮, হাদীস্ নং ১৮৫৮।

সা'ঈদ বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার ﷺ বলতেন যে, "স্বামীর দিয়াহ্-এর (দুর্ঘটনাজনিত হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ) অর্থ কেবল তার পিতৃকুলের পুরুষ আত্মীয়দের প্রদান করা হবে, কোনো মহিলা তার মৃত স্বামীর দিয়াহ-এর অর্থ থেকে কোনো অংশই পাবে না।" তার পর আদ্-দহ্হাক ইব্‌ন সুফ্য়ান ﷺ তাকে বললেন, "আশ্‌য়াম আদ্-দিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াহ-এর অর্থ থেকে কিছু অংশ প্রদান করার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।" এ কথা শুনে 'উমার ﷺ তাঁর মত প্রত্যাহার করে নিলেন।'

সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ২, পৃ. ৮২৬, হাদীস্ নং ২৯২১। শাইখ আলবানি এ হাদীস্‌টিকে সহীহ্ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। সহীহ্ সুনানি আবি দাঊদ, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১৯৮৯), খণ্ড ২, পৃ. ৫৬৫, হাদীস্ নং ২৫৪০।

তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে—এ নিয়ে সাহাবিগণ বিভিন্ন মতামত দিতে লাগলেন। তখন আবু বাক্‌র ﷺ তাঁদের সামনে বর্ণনা করেন যে, নাবি ﷺ বলেছেন, "নাবিগণ যেখানে মারা যান সেখানেই সমাহিত হন।" এ কথা শোনামাত্র সাহাবিগণ ব্যক্তিগত মতামত প্রত্যাহার করে নাবি ﷺ -এর স্ত্রী 'আ'ইশাহ ﷺ-এর গৃহে তাঁর বিছানার নিচে কবর খনন করলেন।

সবশেষে কোনো বিষয়ে নাবি ﷺ থেকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলে এবং সাহাবিদের মধ্যেও ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলে, তাঁরা একে অপরের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁরা কখনোই কারও উপর বিশেষ কোনো একটি মত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন না। তবে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে—এমন কোনো বিষয়কে লোকেরা যদি অনুসরণ করতে চাইত, কেবল তখনই সাহাবিগণ তা দমন করতে চাপ প্রয়োগ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুত'আহ বিয়ে হলো প্রাক-ইসলামি যুগের এক ধরনের সাময়িক বিয়ে। ইসলামের শুরুর দিকে এই বিয়ের প্রথা অনুমোদিত ছিল, তবে নাবি ﷺ-এর ইন্তেকালের পূর্বেই তিনি তা নিষিদ্ধ করেন। নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি না-জানার কারণে কোনো কোনো সাহাবি 'উমার ﷺ-এর খিলাফাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত মুত'আহ বিয়ে করেছেন। 'উমার ﷺ এ ব্যাপারটি জানার পর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে এ অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেন।[৪]

দলাদলির অনুপস্থিতি

যদিও সাহাবিগণ শার'ই আইনের কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তবে তাঁদের মতপার্থক্য পরবর্তী যুগের মতো ব্যাপক অনৈক্য ও দলাদলির জন্ম দেয়নি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর কারণে সর্বাবস্থায় তাঁদের ঐক্যের বন্ধন অটুট ছিল:

---

(৪) 'আবদুল-হামিদ সিদ্দীকি, সহীহ্‌ মুসলিম, (লাহোর: এস এইচ, মুহাম্মাদ আশরাফ, ১৯৭৬), খণ্ড ২, পৃ. ৬১০-৬১১।

১. কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনা তথা শূরার মাধ্যমে খলীফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২. মতৈক্যে পৌঁছানোর সহজতা। প্রথম দিকের খলীফাগণ বিশিষ্ট সাহাবিদের ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী মাদীনাহ থেকে বেশি দূরে বসবাসের অনুমতি দিতেন না, তাই খুব সহজেই তাঁদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা যেত।

৩. বিনয়ের কারণে অধিক ফাতওয়া প্রদানে সাহাবিদের অনাগ্রহ। নিজেরা উত্তর না দিয়ে জটিল প্রশ্নগুলোকে তাঁরা অধিকতর জ্ঞানী সাহাবিদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

৪. হাদীসের যথেচ্ছ উদ্ধৃতি থেকে বিরত থাকা। তাঁরা সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব সমস্যার মধ্যেই হাদীসের উদ্ধৃতিকে সীমিত রাখতেন। এর কারণ ছিল—

৪.ক. নাবি ﷺ-এর হাদীসের সঠিক প্রয়োগ কিংবা বর্ণনায় ভুল হওয়ার আশঙ্কা। কারণ, তিনি বলেছেন,

“যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো মিথ্যা কথা বলে, সে যেন নিজেই জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিল।”(৫)

৪.খ. খলীফা ‘উমার رضي الله عنه হাদীসের মাত্রাতিরিক্ত উদ্ধৃতি প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সাহাবিগণকে কুর’আন বর্ণনা ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন।

এ যুগের ফিক্বহের বৈশিষ্ট্য

ফিক্বহশাস্ত্রের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও মাযহাবগুলোর বিবর্তনের ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, রাজনৈতিক ও

(৫) সহীহ বুখারি, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪২, হাদীস নং ৬৬৭ এবং সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৩৬, হাদীস নং ৩৬৪৩।

আর্থ-সামজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে ফিক্‌হশাস্ত্র বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

প্রথমত, ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগে ফিক্‌হশাস্ত্রের বিশেষত্ব ছিল এর অসাধারণ বাস্তববাদী রূপ (realism)। অর্থাৎ, অনুমান বা কল্পনার পরিবর্তে এ যুগের ফিক্‌হশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে। উমাইয়া শাসনামলে ইরাকের কুফায় আহ্‌লুর-রা'ই হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট ফাকীহগণ সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানকেন্দ্রিক যে-ফিক্‌হশাস্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, তা থেকে আলাদা করতে পরবর্তীকালে বাস্তব সমস্যাকেন্দ্রিক ফিক্‌হশাস্ত্রকে আল-ফিক্‌হ আল-ওয়াকি'ই বা বাস্তববাদী ফিক্‌হ বলে অভিহিত করা হতো।

দ্বিতীয়ত, ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা আইনগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁদের কেউই গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সর্বাবস্থায় অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নির্ধারণ করে দেননি। তাছাড়া, কুর'আন-সুন্নাহ থেকে বের করে আনা বিধিবিধানের কোনো সংকলনও তাঁরা প্রস্তুত করেননি। তাঁদের এই কর্মপন্থা থেকে দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

১. শারী'আতে যেসব বিষয় সুনির্দিষ্ট নয় সেসব ক্ষেত্রে সাহাবিগণ উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে কুর'আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে গৃহীত ভিন্ন মতের প্রতিও তাঁদের সম্মানবোধ ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য যে, তাঁদের এ মানসিকতা পরবর্তী পর্যায়ের 'আলিমদের কারও কারও মধ্যে দৃশ্যমান কঠোরতা থেকে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

২. কুর'আনে যেসব বিধান আলোচিত হয়নি সেসব বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পেছনে না-লেগে তাঁরা কুর'আন অধ্যয়নে জনগণকে উৎসাহিত করেছেন। সাহাবিগণের এ দৃষ্টিভঙ্গিও নিঃসন্দেহে উপরোক্ত মানসিকতার সাথে ছিল সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

এ যুগে বিকশিত ফিক্‌হশাস্ত্রের **তৃতীয় বিশেষত্বটি** ছিল আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যক্তিগত মতামত ব্যবহারের বৈচিত্র্য। অধিকাংশ সাহাবি কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আক্ষরিক অর্থগুলো আঁকড়ে ধরাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাধারণত তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানকে এড়িয়ে চলতেন। ইব্ন 'উমার ﷺ ছিলেন একজন প্রথম সারির আইনবিদ। তিনি সারা জীবন মাদীনায় বসবাস করেছেন এবং এ নীতির অনুসরণ করেছেন। অন্যদিকে, সহাবিদের অনেকেই কুর'আন–সুন্নাহ্য় আলোচিত হয়নি এমন সব বিষয়ে ব্যাপক হারে ব্যক্তিগত মত ব্যবহার করতেন। তবে, এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুলকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের প্রতি আরোপ করতেন, যেন তাঁদের ভুলের কারণে ইসলামি আইনের কোনো দুর্নাম না ঘটে। এমন চিন্তাধারার সহাবিদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ ﷺ ছিলেন অন্যতম। তিনি পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে ইরাকে বসবাস শুরু করেন।

ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগে ফিক্হের **চতুর্থ বিশেষত্বটি** ছিল শারী'আহ আইনের কিছু সংস্কারের সাথে সংশ্লিষ্ট । মূলত দুটি কারণে এ সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এগুলো হলো:

১. আইনের নেপথ্য কারণের অনুপস্থিতি। খলীফা 'উমার বাইতুল-মাল বা কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে নওমুসলিম ও ইসলাম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের নগদ উপহার প্রদানের ধারাকে স্থগিত করে দেন। তাঁর যুক্তি ছিল, নাবি ﷺ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে এমনটি করেছেন। কারণ, তখন ইসলামের সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু, এখন আর দান-সাদাকাহ করে সমর্থক সংগ্রহের প্রয়োজন নেই।

২. সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের পরিবর্তন এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নতুন বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ আগমনের ফলে এক ও একাধিক বিবাহ সম্পাদন তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে বিবাহ-বিচ্ছেদের হারও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের বৈধতার অপব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে খলীফা 'উমার ﷺ এ সংক্রান্ত আইনের কিছুটা সংস্কার সাধন করেন। নাবি ﷺ-এর যুগে একই সময়ে তিন তালাকের উচ্চারণকে কেবল এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো এবং তা ছিল প্রত্যাহারযোগ্য। খলীফা 'উমার ﷺ একই সময়ে একাধিক তালাক প্রদান করলে তাকে কার্যকর ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঘোষণা করেন।

পঞ্চমত, ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগে একটিই মাযহাব ছিল এবং নাবি ﷺ-এর যুগের ন্যায় তা রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। প্রত্যেক খলীফার যুগে খলীফার মাযহাবই ছিল একমাত্র মাযহাব। কারণ, ইজতিহাদ ও ইজমা' সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খলীফার মতামতই ছিল চূড়ান্ত। খলীফার জীবদ্দশায় কেউই কুর'আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে তাঁর গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতেন না। তবে, অন্য কোনো খলীফা ক্ষমতায় আসার পর তাঁর মতকে পূর্ববর্তী খলীফার মতামতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হতো। অনেক সময় পূর্ববর্তী খলীফার সিদ্ধান্তগুলোকে পরিবর্তন করে নতুন খলীফার মতকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হতো।

অধ্যায় সারাংশ

১. ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগেই কুর'আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ফিক্‌হের মূলনীতি অর্থাৎ ইজমা' ও কিয়াস তথা ইজতিহাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

২. নতুন নতুন অঞ্চলের বিজয়ের ফলে মুসলিমগণ বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। এর ফলে জন্ম নেয় বেশ কিছু নতুন সমস্যা যেগুলো শারী'আহ আইনে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচিত হয়নি।

৩. শারী'আতে সুস্পষ্ট বিধান নেই এমন অনেক বিষয়ে আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যকে যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় সে লক্ষ্যে ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা পর্যায়ক্রমে ইজতিহাদের কিছু পদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

৪. সহাবিগণও সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। এগুলো কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে এড়িয়ে চলতে তাঁদেরকে সাহায্য করত।

৫. সহাবিগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার সমন্বিত অনুমোদনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। ফলে তাঁদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পেত এবং এ কারণেই সে যুগের মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে কোনো দলাদলির সৃষ্টি হয়নি।

৬ ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগে কেবল একটি মাযহাবই ছিল। আইন প্রণয়নে একতাবদ্ধ পন্থা অনুসরণের ফলে এ যুগের শেষ অবধি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মাযহাব গড়ে ওঠেনি।

৭ জনগণ কুর'আন অধ্যয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে হাদীসের মাত্রাতিরিক্ত উদ্ধৃতি প্রদানকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল।

৮ যদিও ব্যক্তিগত মত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহাবিগণের পরস্পরের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য ছিল, তবে সে পার্থক্য ঐ যুগে কোনো রূপ দলাদলিতে পর্যবসিত হয়নি।

৯ ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগে ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি সার্বজনীন পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে; অর্থাৎ তখন একটি মাযহাবই চালু ছিল। তবে, ব্যক্তিগত মত প্রদান প্রসঙ্গে মাদীনায় ইব্‌ন 'উমার ﷺ ও ইরাকের কুফায় 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ ﷺ-এর মতো বিশিষ্ট সহাবিদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। উল্লেখ্য যে, তাঁদের এই মতপার্থক্যকে পরবর্তী যুগের 'আলিমদের বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হওয়ার সূচনাবিন্দু কিংবা প্রচ্ছন্ন পূর্বাভাষ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পর্যায়: নির্মাণ

এ পর্যায়ে রয়েছে উমাইয়া রাজবংশের উত্থান ও পতন। ৪০ হিজরিতে (৬৬১ সাল) খলীফা 'আলি ইব্ন আবি ত্বালিব ﵁-এর মৃত্যুর পর উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা খলীফা মু'আউইয়াহ ইব্ন আবি সুফ্য়ান ﵁ ক্ষমতাসীন হন। তখন থেকে নিয়ে ১৩১ হিজরি (৭৪৯ সাল) পর্যন্ত প্রায় এক শ বছর উমাইয়াগণ ক্ষমতাসীন ছিলেন।

উমাইয়া শাসনামলের প্রায় পুরো সময় জুড়েই ছিল সামাজিক অস্থিরতা। গোটা মুসলিম উম্মাহ তখন বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খিলাফাহকে তখন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত করা হয়। চালু করা হয় অসংখ্য নতুন নতুন প্রথা, যার কিছু কিছু ছিল হ়ারাম। তৎকালীন বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই খলীফার সভাসদদের কাতারে শামিল হতে অসম্মতি জানান। এমনকি সংঘাত ও সংশয় এড়ানোর জন্য তাঁরা ইসলামি শাসনের কেন্দ্র থেকে দূর-দূরান্তে চলে যান।[১]

ফিক্হশাস্ত্র ও মায্হাবগুলোর ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপট থেকে এ সময়টি তিনটি প্রধান কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ খিলাফাতের প্রাণকেন্দ্র থেকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ইজমা' কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। ফলে মুসলিম ফাক়ীহ্গণের ব্যক্তিগত ইজতিহাদের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, লোকেরা ব্যাপক হারে হ়াদীস় বর্ণনা করতে শুরু করে। ফলে হ়াদীস় জালকরণের ক্রমবর্ধমান একটি ঘৃণ্য প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে, সহ়াবিগণের ইজতিহাদকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ সময়েই ফিক্হ সংকলনের প্রথম প্রয়াস চালানো হয়। এ যুগেই ইসলামি

(১) আল-মাদখাল, পৃ. ১২১–১২২।

আইনের বিশেষজ্ঞগণ প্রথমবারের মতো পৃথক পৃথক মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এগুলোর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চারটিতে এসে দাঁড়ায়।

ফিক্হশাস্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো

ফিক্হশাস্ত্র ও মাযহাবগুলোর বিবর্তনের ইতিহাসে এ যুগটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিকগুলো সবিস্তারে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. মুসলিম উম্মাহ্র বিভাজন

এ যুগের প্রথম দিকেই মুসলিম জাতির উপর নেমে আসে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত। এর পরিণতিতে বেশ কয়েকটি দল ও উপদলের উৎপত্তি ঘটে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল খাওয়ারিজ[২], শী'আহ[৩] এবং 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আয-যুবাইর ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের[৪] বিদ্রোহ। শাসনক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বিবাদমান এ দলগুলোর নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা।

খাওয়ারিজ ও শী'আহ এই দুটি উপদল পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কুর'আন ও সুন্নাহ্র অপব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে এরা নিজেদের বিকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণ মনগড়া এক পৃথক ফিক্হশাস্ত্র গড়ে তোলে। তারা ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফা ও অধিকাংশ সাহাবির অবদানকে অস্বীকার করে। এমনকি তাঁদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে নিজেদের নেতৃবৃন্দকে আইন প্রণেতার আসনে বসিয়ে দেয়।

---

(২) বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন।

(৩) প্রাগুক্ত।

(৪) প্রাগুক্ত।

২. উমাইয়া খলীফাদের বিচ্যুতি

উমাইয়া খলীফাগণ তৎকালীন বাইজান্টাইন, পারস্য ও হিন্দুস্তানের অনৈসলামি রাষ্ট্রগুলোতে প্রচলিত বেশ কিছু প্রথাকে নিজ দরবারে চালু করেন। এসব কুপ্রথার অনেকগুলোই ছিল ইসলামের প্রথম যুগের রীতিনীতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেন্দ্রীয় কোষাগার (বাইতুল-মাল) খলীফা ও তাঁর পরিবারের লোকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার হীন উদ্দ্যেশ্যে সাধারণ জনগণের উপর শারী'আহ সমর্থিত নয় এমন ধরনের করও আরোপ করা হয়। খলীফার দরবারে বিনোদনের নামে সংগীত, নর্তকী, গায়িকা, জাদুকর ও জ্যোতির্বিদদের সরকারিভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অধিকন্তু, ৫৯ হিজরিতে (৬৭৯ সাল) খলীফা মু'আউইয়াহ ﷺ তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে তার পরবর্তী শাসক হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তখন থেকেই খিলাফাহ ব্যবস্থা এক ধরনের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রের সাথে ফিক্হশাস্ত্র ও ফাকীহদের সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং 'আলিমদের মতামতের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করার সুযোগটি প্রায় একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যায়। এসব কারণে এ যুগের ন্যায়নিষ্ঠ 'আলিমগণ খলীফার সভাসদ হওয়াকে এড়িয়ে চলতেন। ফলে পরামর্শভিত্তিক শাসন বা শূরা' নীতিটিও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক নতুন খলীফার শাসনামলেই শাসনব্যবস্থার অবনতি হতে হতে একসময় তা তৎকালীন অনৈসলামি সরকারগুলোর ন্যায় একনায়কতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রূপ ধারণ করে। কতিপয় খলীফা নিজেদের নীতিহীনতাকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে ফিক্হশাস্ত্রকে ব্যবহার করার অপচেষ্টা করেন। এ বিকৃতির মোকাবিলা করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিশুদ্ধ ফিক্হশাস্ত্র রেখে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ প্রথম যুগের ফিক্হশাস্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলন করতে শুরু করেন।

৩. বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া

উমাইয়া শাসনামলে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সংঘাত, সংশয় ও বিবাদমান দলগুলোর হানাহানি থেকে বাঁচার জন্য রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে সরে পড়েন। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষজ্ঞগণ ছড়িয়ে

পড়ার কারণে ইজমা'র মূলনীতিগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হারিয়ে যায়। এমনকি কোনো নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইজমা'য় উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ এলাকায় বহু নতুন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য ব্যাপক হারে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের উপর নির্ভর করতেন। ফলে ইজতিহাদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। যখনই কোনো এলাকায় ফিক্‌হশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটত, তখনই সে এলাকার শিক্ষার্থী ও 'আলিমগণ তাঁর কাছে জড়ো হতেন। মাঝেমধ্যে অন্যান্য এলাকার শিক্ষার্থী ও 'আলিমগণও তাঁদের সাথে এসে যোগ দিতেন। আর এভাবেই গড়ে উঠেছিল ইসলামি আইন তথা ফিক্‌হশাস্ত্রের বিভিন্ন মাযহাব। এ যুগে কুফাতে ইমাম আবু হানীফাহ ও সুফ্য়ান আস্-সাওরি, মাদীনায় মালিক ইব্‌ন আনাস, বৈরুতে আল-আওযা'ই এবং মিশরে আল-লাইস্ ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৪. হাদীস্ জালকরণ

এ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়, ফলে হাদীস্ বর্ণনার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অঘোষিতভাবেই নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ একরকম বন্ধ হয়ে যায়। তখন বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক মাসআলা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞগণ সাহাবি ও তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস্‌কে খুঁজে বের করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই সময়ে একটি জঘন্য প্রবণতাও দেখা দেয়। আর তা হলো, এই প্রথমবারের মতো বিভিন্ন কথা ও কাজকে নাবি ﷺ-এর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করা হয় যা তিনি বলেননি বা করেননি। হাদীস্ জালকারীরা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য জাল হাদীসের পাশাপাশি কিছু সঠিক হাদীস্‌ও বর্ণনা করত। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ হাদীস্‌গুলো সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে হাদীস্ সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জাল হাদীস্‌গুলোকে সহীহ্ হাদীস্ থেকে আলাদা করার জন্য বিকশিত হয় হাদীস্‌শাস্ত্র। এগুলো পরবর্তী যুগের বিশেষজ্ঞদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হাদীস্‌শাস্ত্র বিকাশ লাভের পূর্বে সত্য ও মিথ্যা বর্ণনার মিশ্রিত কিছু বিষয় ইসলামি জ্ঞানের ভাণ্ডারে স্থান করে নেয় এবং সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ 'আলিম অসাবধানতাবশত তা ব্যবহারও করেন। এভাবে, অশুদ্ধ ফিক্‌হের একটি ধারা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে কতিপয় বিশেষজ্ঞের কিছু আইনগত সিদ্ধান্তের কারণে এই অশুদ্ধ ফিক্‌হ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর এর প্রধানতম কারণ ছিল, 'আলিমদের অনেকেই বেশ কিছু সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ, তাঁরা সেসব হাদীস কেবল হাদীস জালকারী হিসেবে পরিচিত এলাকার ঘৃণ্য লোকদের মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন।(৫)

উমাইয়া যুগের ফিক্‌হের বৈশিষ্ট্য

এ যুগে বিশেষজ্ঞ 'আলিম ও শিক্ষার্থীগণ দুটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক দল বিশেষজ্ঞ আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সরাসরি কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র প্রমাণের উপরই নির্ভর করতেন। অন্যদিকে অপর দলটি যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে ও ইজতিহাদ ও কিয়াসের ব্যাপক ব্যবহারকে বেছে নিয়েছিলেন।

কোনো বিষয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট প্রমাণ না-থাকলে প্রথম দলটি সে বিষয়ে আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানকে এড়িয়ে চলতেন। তাঁদের অবস্থানের ভিত্তি ছিল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... ﴿٣٦﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না।"

(আল-ইস্‌রা ১৭:৩৬)

যেসব আইনের উদ্দেশ্যাবলি আল্লাহ ﷻ অথবা তাঁর রসূল ﷺ চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সেই একই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনে উল্লিখিত আইনগুলোকে মূলনীতি হিসেবে ব্যবহার করে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (কিয়াস)(৬) করা

(৫) আল-মাদখাল, পৃ. ১২১–১২৬।

(৬) সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থার ভিত্তিতে যুক্তিযুক্তভাবে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

হতো। পক্ষান্তরে, যেসব আইনের উদ্দেশ্যাবলি কুর'আন ও সুন্নাহতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিয়াসের মাধ্যমে বিধিবিধান বের করে আনার ক্ষেত্রে সেসব আইনকে মূলনীতি হিসেবে ব্যবহার করা হতো না। এ নীতি অবলম্বনের কারণে এ মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের বলা হতো আহ্‌লুল-হাদীস্। এই ধারার বিশেষজ্ঞদের কেন্দ্র ছিল মাদীনাহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদীনার এ মাযহাবের ফিক্‌হশাস্ত্র ছিল প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে গঠিত।

বিশেষজ্ঞদের অপর দলটির মতে, যদিও আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূল ﷺ শারী'আহর সব আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেননি, কিন্তু শারী'আহর প্রত্যেকটি আইনের নেপথ্যেই রয়েছে কোনো-না-কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ। এই দলের বিশেষজ্ঞগণ নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এমন প্রতিটি আইনের সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করেছেন যেগুলোর নেপথ্য কারণ সুস্পষ্ট নয়। তার পর একই রকমের পরিস্থিতিতে তাঁরা সেই আইনগুলোকে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের এ পদ্ধতির ভিত্তি ছিল কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবির কর্মপদ্ধতি—যাঁরা বেশ কিছু ওয়াহয়িভিত্তিক আইনের নেপথ্য কারণ খুঁজে বের করে সে অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। যুক্তি-বুদ্ধির ব্যাপক ব্যবহারের কারণে, এ দলের 'আলিমগণ আহ্‌লুর-রা'ই নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই বিশেষজ্ঞদের কেন্দ্র ছিল ইরাকের কুফা। কুফার আইনশাস্ত্র প্রধানত বিকশিত হয়েছিল 'সম্ভাব্য সমস্যার' বিষয়টি সামনে রেখে। অর্থাৎ, ঘটতে পারে এমন ধরনের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করা হতো। এর পর সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে অনুমান করে তার সমাধান বের করা হতো ও লিপিবদ্ধ করা হতো। তাঁদের আলোচনায় প্রায়ই তাঁরা এমন প্রশ্নের উত্থাপন করতেন যে, 'যদি ব্যাপারটি এমন হয়, তাহলে সমাধান কী হবে?'। উল্লেখ্য যে, এ দুটি ধারা ছিল মূলত সাহাবিগণের মধ্যে প্রাথমিকভাবে দৃশ্যমান দুটি ভিন্ন পন্থার সম্প্রসারণ মাত্র।

মতবিরোধের কারণ

আহ্‌লুল-হাদীস্ ও আহ্‌লুর-রা'ই 'আলিমদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের পেছনে সক্রিয় ছিলো কিছু রাজনৈতিক ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট

এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি। ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার সর্বশেষ খলীফা 'আলি ইব্‌ন আবি ত়ালিব ﷺ-এর শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী ইরাকে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে রাজধানীকে সরিয়ে সিরিয়ায় নেওয়া হয়। এ কারণে রাষ্ট্রের কেন্দ্রে সংঘটিত বিভিন্ন গোলযোগ, বিদেশি সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রভাব থেকে হ়িজায[৭] অঞ্চল কিছুটা মুক্ত ছিল। রাজধানী থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে হ়িজাযের জীবনযাত্রা ছিলো বেশ সহজ-সরল ও সাদামাটা। হ়িজায ছিল নাবি ﷺ-এর আবাস ও ইসলামি রাষ্ট্রের জন্মভূমিও। ফলে হ়াদীসের প্রাচুর্যের পাশাপাশি এ অঞ্চলে ছিল প্রথম তিন খলীফা আবু বাক্‌র, 'উমার ও উস়মান ﷺ-এর প্রণীত ফিক়হি সিদ্ধান্তের এক বিশাল ভাণ্ডার।

অন্যদিকে ইরাক ছিল মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন দেশ। সেখানে যখন ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপন করা হলো, তখন তা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির এক মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে এমন অনেক পরিস্থিতি ও ঘটনার উদ্ভব হতে থাকে যেগুলো ছিল ঐ সময়ের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার বাইরে। অধিকন্তু, ইরাকে বসবাসকারী স়াহ়াবিদের সংখ্যা কম হওয়ায় সেখানে প্রাপ্ত হ়াদীসের পরিমাণও ছিল মাদীনার তুলনায় কম। একই সাথে ইরাক পরিণত হয় জাল হ়াদীসের জন্মভূমি এবং প্রথম দিকের অধিকাংশ বিভ্রান্ত দলগুলোর বিকাশকেন্দ্রে। হ়াদীস় জালকারীদের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের কারণে হ়াদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন রকম সংশয় সৃষ্টি হওয়ায় ইরাকের বিশেষজ্ঞগণ কেবল তাঁদের দৃষ্টিতে সঠিক মনে হওয়া হ়াদীসগুলোকেই গ্রহণ করতেন। অত্যন্ত কঠোর কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাঁরা এই হ়াদীসগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতেন। ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক এ প্রেক্ষাপটে ইরাকি মায়হাব ও সেখানকার বিশেষজ্ঞগণ যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার উপর অনেক বেশি নির্ভর করতেন।[৮]

---

(৭) মাক্কা ও মাদীনাসহ আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল।

(৮) আল-মাদখাল, পৃ. ১২৬–১২৭।

ফিক্‌হ সংকলন

হিজরি ১১—৪০ (৬৩২—৬৬১ সাল) সালের মধ্যে অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগে সহাবিগণের দেওয়া কোনো ফাতওয়া সংকলন করা হয়নি। সেসময় মুসলিম রাষ্ট্রটি খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল; আর সবকিছুই ছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল। ব্যাপক হারে হাদীসের বর্ণনা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। প্রথম যুগের বিশিষ্ট সহাবিগণ নতুন মুসলিম জাতিটিকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করেছিলেন মাত্র। তাই সহাবিগণের ফাতওয়া ও মতামতগুলোর সংকলন প্রস্তুত করার মতো সময় ও সুযোগ—কোনোটাই তাঁদের ছিল না। অধিকন্তু, সহাবিগণ নিজেদের ইজতিহাদি সিদ্ধান্তগুলোকে গোটা মুসলিম জাতির উপর বাধ্যতামূলকও মনে করতেন না। বরং তাঁরা সেগুলোকে নিছক তাঁদের বিশেষ সময় ও অবস্থার জন্য প্রযোজ্য মতামত হিসেবে বিবেচনা করতেন।

উমাইয়া শাসনামলেই সর্বপ্রথম ফিক্‌হি সিদ্ধান্তগুলোর একটি সংকলন প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কারণ, এ যুগে সরকার কাঠামো খিলাফাহ থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়ার পর প্রায়ই সহাবিগণের মতামতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। সহাবিদের অধীনে যারা পড়াশোনা করেছিলেন তাঁরা অনুধাবন করলেন যে, প্রাথমিক যুগের আইনগত সিদ্ধান্তগুলোকে সংরক্ষণ করার সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া না-হলে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্ম সহাবিদের অবদান থেকে উপকৃত হওয়ার কোনো সুযোগ পাবে না। এ কারণেই, তখন হিজাযের বিশেষজ্ঞগণ 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার এবং 'আ'ইশাহ বিনতু আবি বাক্‌র[৯] ﷺ-এর আইনগত মতামতগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। একইভাবে ইরাকি বিশেষজ্ঞগণ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ ও 'আলি ইব্‌ন আবি তালিব ﷺ-এর আইনগত মতামতগুলো সংকলন করেন। দুর্ভাগ্যবশত এসব সংকলনের কোনোটিই আদি রূপে টিকে নেই। তবে, পরবর্তী প্রজন্মের বিশেষজ্ঞদের লেখা গ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত তাঁদের উদ্ধৃতিগুলো থেকে তাঁদের মতামত জানা

(৯) নাবি ﷺ-এর তৃতীয় স্ত্রী।

যায়। আদি সংকলনগুলোর অনেক আইনগত সিদ্ধান্ত ও মতামত—হাদীস, ইতিহাস ও পরবর্তী যুগে রচিত ফিক্‌হের গ্রন্থগুলোতে সংরক্ষিত আছে।

অধ্যায় সারাংশ

১. উমাইয়া শাসনামলে ফিক্‌হ্ সংকলনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২. এ যুগের বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের এক দলকে আহ্‌লুল-হাদীস্ এবং অন্য দলকে আহ্‌লুর-রা'ই নামে অভিহিত করা হতো। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের ছড়িয়ে পড়ার কারণে ব্যক্তিগত ইজতিহা-দের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এভাবেই বেশ কয়েকটি নতুন মায্হাব বিকাশ লাভ করে।

৩. ন্যায়নিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ উমাইয়া খলীফাদের দরবার পরিহার করায় ইজমা' ও পরামর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার নীতিমালা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪. উমাইয়াগণ সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাই ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সংরক্ষণ করতে খিলাফাতের কেন্দ্র থেকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া বিশেষজ্ঞগণ নিজেরাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধ্যানুযায়ী হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। আর তাঁরাই সবচেয়ে প্রখ্যাত সহাবিদের আইনগত সিদ্ধান্তগুলো সংকলনের উদ্যোগ নেন।

৫. সামাজিক অস্থিরতা ও গোলযোগ ছিল এ যুগের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সময়ে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপদলের সৃষ্টি হয়।

৬. এ যুগেই প্রথম বারের মতো দলকেন্দ্রিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে ব্যাপক পরিমাণ জাল হাদীস্ বিস্তার লাভ করে। ফলে, বিশেষজ্ঞগণ

৭ হাদীস সংকলন ও হাদীসের যাচাই-বাছাইমূলক পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ পর্যায়: বিকাশ

এ যুগের ব্যাপ্তি আনুমানিক ১৩২ হিজরি (৭৫০ সাল) থেকে আনুমানিক ৩৪০ হিজরি (৯৫০ সাল) পর্যন্ত। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে খলীফা আবুল-'আব্বাসের[১] (শাসনকাল ১৩২-১৩৬ হিজরি) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'আব্বাসি খিলাফাতের গোড়াপত্তন, ক্ষমতা সুসংহতকরণ ও পতনের সূচনা। এ যুগেই ফিক্‌হশাস্ত্র ইসলামি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি জ্ঞান চর্চা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে। মাযহাবের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। হাদীস্ ও ফিক্‌হের বেশ কয়েকটি সংকলন প্রস্তুত করা হয়। তৎকালীন বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের পুস্তকগুলোর আরবি অনুবাদগুলোও ইসলামি চিন্তাধারার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ যুগের শেষের দিকে ফিক্‌হশাস্ত্র সুস্পষ্ট দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। এগুলোর একটি হলো উসূল তথা মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত এবং অন্যটি হলো বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি ফুরূ'ই বা শাখাগত বিভিন্ন বিষয়। এ সময়ই ইসলামি আইনের বিভিন্ন উৎসগুলো শনাক্ত করা হয়। প্রধান মাযহাবগুলোর মধ্যকার বেশ কিছু মতপার্থক্য তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে ফেলে।[২]

---

(১) 'আব্বাসিগণ ছিলেন নাবি ﷺ-এর চাচা 'আব্বাস এর বংশধর।

(২) আল-মাদখাল, পৃ. ১২৮।

ফিক্হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

ফিক্হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের এ যুগে মাযহাবগুলোর বিবর্তনে দুটি প্রধান ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ধারাটি দেখা যায় প্রধান মাযহাবগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যক্তি বিখ্যাত ইমাম ও তাঁদের বিশিষ্ট ছাত্রদের যুগে। যদিও এ মাযহাবগুলো খুব দ্রুত স্বতন্ত্র রূপ লাভ করছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রদান ও মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রথম যুগের পরমতসহিষ্ণুতার ধারা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় ধারাটি পরিলক্ষিত হয় মাযহাবগুলোর বিশিষ্ট ইমাম ও 'আলিমদের ইন্তেকালের পর। তখন থেকেই ফিক্হি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদান করার ক্ষেত্রে কঠোরতার সূচনা হয়। এটি পরবর্তী প্রজন্মের ফিক্হশাস্ত্র ও মাযহাবগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

মহান ইমামদের যুগ

মহান ইমাম ও তাদের প্রধান ছাত্রদের যুগে অর্থাৎ আনুমানিক হিজরি ১৩২–২৩৫ সালে (৭৫০-৮৫০ সাল) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফিক্হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশকে প্রভাবিত করে।

১. বিশেষজ্ঞদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সমর্থন

প্রথম দিককার 'আব্বাসি খলীফাগণ ইসলামি আইন ও এর বিশেষজ্ঞদের প্রতি খুবই সম্মান প্রদর্শন করতেন। কারণ শারী'আহ ও এর সঠিক ব্যাখ্যাভিত্তিক খিলাফাতের দিকে ফিরে যাবেন—এমন একটি দাবি নিয়েই তারা ক্ষমতায় এসেছিলেন। ফলে এ যুগের 'আব্বাসি খলীফাগণের প্রায় প্রত্যেকেই জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে নিজ সন্তানদের তৎকালীন প্রধান 'আলিমদের কাছে পাঠিয়ে গর্ববোধ করতেন। এমনকি কতিপয় খলীফা নিজেরাও ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়েছিলেন, যেমন খলীফা হারূন আর-রাশীদ, যার শাসনকাল হলো ১৭০ হিজরি (৭৮৬ সাল) থেকে ১৯৩ হিজরি (৮০৯ সাল) পর্যন্ত। তাছাড়া, তখন খলীফাগণ পুনরায় ফিক্হি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ফাকীহ্দের সাথে পরামর্শ করার রীতি চালু

করেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম মালিককে নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ্‌র উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন খলীফা আল-মানসূর। রচনা সম্পন্ন হওয়ার পর খলীফা গ্রন্থটিকে রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ইমাম মালিকের সাথে পরামর্শ করেন। এমনটি করা হলে ইমাম মালিকের মাযহাব গোটা মুসলিম জাতির উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। কিন্তু ইমাম মালিক এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কারণ, তিনি জানতেন যে তার সংকলনে কেবল তাঁর জন্মভূমি ও নিজ মাযহাবের বিকাশকেন্দ্র হিজায অঞ্চলে প্রাপ্ত নাবি ﷺ-এর সুন্নাহগুলোই স্থান পেয়েছে। তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনো একক মাযহাব গোটা মুসলিম জাতির উপর বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। কারণ, যেকোনো একক মাযহাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া সহাবিদের মাধ্যমে বর্ণিত অনেক হাদীসই বাদ পড়ে যাবে।[৩] নিঃসন্দেহে এ মনোভাব মহান ইমামদের দূরদৃষ্টি ও উদারতার সুস্পষ্ট উদাহরণ। ফিক্‌হশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় এসময় অনেক মাযহাব বিকশিত হয়। এই মাযহাবগুলোর উন্মেষ ঘটেছিল মূলত উমাইয়া যুগের শেষের দিকে।

উল্লেখ্য যে, বিশেষজ্ঞ ও বিচারকদের মত প্রকাশের বিপুল স্বাধীনতা দেওয়া হলেও সরকারি সিদ্ধান্তের বিপরীত মত দেওয়ার কারণে তাদের প্রায়ই কঠোর শাস্তি পেতে হতো। উদাহরণস্বরূপ, 'আব্বাসি খলীফার একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দেওয়ার কারণে ইমাম মালিককে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হয়। খলীফার প্রণীত সেই নীতি অনুযায়ী লোকদের এই মর্মে শপথ বাক্য পাঠ করানো হতো যে, খলীফার প্রতি আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করলেই স্ত্রীদের সাথে তাদের তলাক্ব হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মালিক ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে, ইসলামি বিধান অনুযায়ী তলাকের ব্যাপারে এধরনের আইনের কোনো কার্যকারিতা নেই।

---

(৩) মুহাম্মাদ রহীমুদ্দীন, আল-মুয়াত্তা' ইমাম মালিক এর অনুবাদ, (নয়া দিল্লি: কিতাব ভবন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১), মুখবন্ধ পৃ. ৫।

২. শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি

এ পর্যায়ে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের[৪] রাষ্ট্রগুলো 'আব্বাসি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে 'আব্বাসি রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত হয়ে সমগ্র পারস্য, ভারত ও দক্ষিণ রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। যদিও রাজধানীকে আর কখনোই বাগদাদে ফিরিয়ে আনা হয়নি। ফলে, শিক্ষাকেন্দ্র ও মাযহাবের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা সমকালীন বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ আইনের বিভিন্ন বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তা জানার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ তাদের কাছে এসে জড়ো হতেন। এর একটি উত্তম উদাহরণ হলো, জ্ঞানার্জনের জন্য ইমাম আবু হানীফাহ্‌র প্রখ্যাত ছাত্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হাসানের পরিভ্রমণ। ইমাম মালিক এর অধীনে অধ্যয়ন ও তাঁর হাদীসগ্রন্থ আল-মুয়াত্তা' মুখস্থ করার লক্ষ্যে তিনি ইরাক থেকে মাদীনায় গমন করেন। অনুরূপভাবে, ইমাম শাফি'ই ইমাম মালিকের অধীনে অধ্যয়নের জন্য প্রথমে হিজায যান। তারপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হাসানের অধীনে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক যান। সর্বশেষ লায়সি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম লাইস ইব্‌ন সা'দ এর অধীনে অধ্যয়ন করার জন্য তিনি মিশর সফর করেন। এসব ভ্রমণের ফলস্বরূপ 'আলিমগণের কিছু মতপার্থক্যের নিষ্পত্তি হয় এবং পরিশেষে বিভিন্ন মাযহাবের মতপার্থক্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যের একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইমাম শাফি'ই ইরাক ও মিশরের ফিক্‌হের সাথে হিজাযের ফিক্‌হের সমন্বয় সাধন করে একটি নতুন ধারা সূচনা করেন। এ থেকে প্রথম যুগের ইমামদের মধ্যে সত্যের অন্বেষণে নিজের মত পরিত্যাগের উদার মানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. মত বিনিময় ও আলোচনার বিস্তৃতি

বিশেষজ্ঞ 'আলিম অথবা তাদের শিষ্যদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হলেই তাঁরা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান

---

(৪) 'আবদুর-রহমান ইব্‌ন মু'আওউইয়াহ নামক এক উমাইয়া রাজপুত্র 'আব্বাসিদের হাত থেকে কোনোক্রমে বেঁচে স্পেনে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। সেখানে সে ১৩৮ হিজরিতে (৭৫৬ সাল) কর্ডোভাতে উমাইয়া রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করে।

নিয়ে মত বিনিময় করতেন। কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের মতপার্থক্য দেখা দিলে তাঁরা সাধারণত দুটি উপায়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতেন:

ক. আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে উপনীত হওয়া।

খ. বিশুদ্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন সমাধান গ্রহণ করা।

আইনগত বিষয়ে এসব মত বিনিময় অনেক সময় চিঠিপত্রের মাধ্যমেও চলত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইমাম মালিক মাদীনার প্রথাকে[৫] ইসলামি আইনের একটি উৎস হিসেবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু ইমাম লাইস্ ইব্ন সা'দ তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে ইমাম মালিকের সাথে এ বিষয়ে মত বিনিময় করেছিলেন।

এ সময় বিভিন্ন মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা মুখোমুখি মত বিনিময়ের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কিছু ভুল সিদ্ধান্তকে ফাকীহ্গণ সংশোধন করে নেন।

মাযহাবগুলোর ক্রমবিকাশের এই প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ইমামগণ ও তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে কঠোরতা ও গোঁড়ামির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। অর্থাৎ, যে কোনো সমস্যাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হতো। ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম শাফি'ই এ ব্যাপারে বলেছেন যে, কোনো হাদীস্ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে তা-ই তাঁদের মাযহাব হিসেবে বিবেচিত হবে। মদ ও অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আবু হানীফাহ রায় দিয়েছিলেন যে, মদের উপর নিষেধাজ্ঞা কেবল গাঁজানো আঙুরের রস (খাম্‌র-এর আক্ষরিক অর্থ) থেকে তৈরি মদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এছাড়া অন্য কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফাহ এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

(৫) ইমাম মালিক মাদীনাবাসীর মতামতকে ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করলে ইমাম লাইস্ তাতে আপত্তি করেন।

আঙুর ব্যতীত অন্যান্য উপাদান থেকে প্রস্তুতকৃত মদ খাওয়া অনুমোদিত, কেবল যদি তা সেবনে পানকারী মাতাল না হয়।[৬] তবে তাঁর প্রধান তিন ছাত্র (আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হাসান ও যুফার) পরবর্তীকালে তাদের শিক্ষকের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ তাঁরা এ ব্যাপারে নাবি ﷺ-এর একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস্ জানতে পেরেছিলেন; যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, খাম্‌র-এর অর্থের মধ্যে সব ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হবে।

এরকম স্বাধীন মতবিনিময় ও মাযহাব প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে গোঁড়ামি ও দলাদলির অনুপস্থিতি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। অথচ পরবর্তী যুগে কঠোরতা ও গোঁড়ামি মারাত্মক আকার ধারণ করে।

‘আলিমদের পরবর্তী প্রজন্ম

মাযহাবগুলোর দ্বিতীয় পর্যায়ের ‘আলিমদের যুগে অর্থাৎ, ২৩৫—৩৩৮ হিজরিতে (৮৫০—৯৫০ সাল) ছাত্রদের দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়:

১. ফিক্‌হ সংকলন

আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদান ও মূলনীতি প্রণয়নের জন্য আগেকার বিশেষজ্ঞগণ হাদীস্ ও আসার (সাহাবিগণ ও তাঁদের ছাত্রদের কথা ও কাজ)-এর খোঁজে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণের পেছনে প্রচুর সময় ও শ্রম দিয়েছেন। এ যুগে নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল ও হাদীস্‌গুলোকে গ্রন্থ আকারে সংকলন করা হয়েছিল। ফলে এ যুগের

(৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন রুশ্‌দ, বিদায়াহ আল-মুজতাহিদ, (মিশর, আল মাকতাবাহ আত-তিজারীয়াহ আল-কুবরা), খণ্ড ১, পৃ. ৪০৫। আরও দেখুন, আস-সায়্যিদ সাবিক, ফিক্‌হ আস-সুন্নাহ, (বৈরুত, দার আল-কিতাব আল-‘আরাবি), ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৭, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭৮।

বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের প্রয়োগ ও পূর্ণ অনুধাবনে মনোনিবেশ করার জন্য প্রচুর সময় পেয়েছেন।

এ যুগে ফিক্হশাস্ত্রও ব্যাপক হারে ও সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত করা হয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আইনগত বিভিন্ন বিষয়ে নিজ মতামতগুলো লিপিবদ্ধ করেন। আবার কেউ কেউ ছাত্রদের সামনে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান আলোচনা করেছেন; পরবর্তীকালে ছাত্ররা তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। যেমন ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবাল-এর মাযহাব এভাবেই সংকলিত হয়েছে। ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা' হলো হাদীস্ ও সহাবাগণের মতামতগুলোর পাশাপাশি তাঁর নিজ অভিমত সম্বলিত একটি সংকলন। অন্যদিকে ইমাম শাফি'ই-র উম্ম্ শীর্ষক ফিক্হ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে প্রমাণসহ তাঁর আইনি মতামত স্থান পেয়েছে।

২. সংকলনের ধরন

ক. প্রথম দিকের ফিক্হ গ্রন্থগুলো ছিল সাধারণত আইনি সিদ্ধান্ত, হাদীস্, সহাবিগণ ও তাঁদের ছাত্রদের মতামতগুলোর এক একটি সমন্বিত সংকলন। ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা' এ শ্রেণির গ্রন্থের একটি উত্তম উদাহরণ।

খ. উসুল আল-ফিক্হ বা ফিক্হ শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালার উপরও বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের প্রণেতাগণ শুধু তাঁদের নিজ সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্যই কেবল বিভিন্ন হাদীস্ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফের[৭] কিতাব আল-খারাজ ও ইমাম শাফি'ই-র কিতাব আল-উম্ম্ এ ধরনের গ্রন্থের উত্তম উদাহরণ।

গ. ফিক্হের অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় হলো ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ। সেগুলোতে খুব অল্প সংখ্যক হাদীসের উদ্ধৃতি এসেছে। এসব গ্রন্থকে আলোচ্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত

(৭) ইমাম আবু হানীফাহ্‌র প্রধান ছাত্র।

করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসানের[৮] ছয়টি গ্রন্থ ও ইমাম ইব্ন আল-কাসিমের[৯] আল-মুদাওয়ানাহ এ শ্রেণির গ্রন্থাবলির কিছু নমুনা।

প্রথম দিকে ফিক্‌হের গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোকে সানাদ বা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা উল্লেখ করা হতো। ক্রমেই বর্ণনাকারীদের ধারার উপর কম গুরুত্ব দেওয়ার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞগণ হাদীসটি কেবল যে গ্রন্থে পাওয়া যাবে তার নাম উল্লেখ করতেন।

হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা, মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করা এবং হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখে অনীহা প্রভৃতি অপচর্চার ব্যাপকতার কারণে হাদীসের গুরুত্বকে মানুষ ভুলতে বসে। এমতাবস্থায় মাযহাবের মতামতই যেন প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এ প্রবণতার কারণে এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, স্বয়ং আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ্‌র উপর মাযহাবগুলোর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়। এভাবেই সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির সূচনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই কঠোরতাই মাযহাবকেন্দ্রিক দলাদলির অন্যতম প্রধান কারণে পরিণত হয়। তবে এ যুগের শেষের দিকে কয়েকজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ হাদীসের উৎস ও বিশুদ্ধতা বর্ণনার রীতি পুনরায় চালু করে বিকৃত এ ধারাকে কিছুটা রোধ করেন।

২. দরবারি বিতর্ক

খলীফা ও রাজ দরবারের সভাসদদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এ যুগে দরবারি বিতর্কের আয়োজন করা হতো। কিছু স্বার্থান্বেষী 'আলিম, জাদুকর, গায়ক, নর্তকী ও ভাঁড়কে দরবারে স্থায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়।[১০] খলীফার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত এই 'আলিমরা পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত এবং কেবল বিতর্কের জন্য বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করত। ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্র একটা নতুন মাত্রা পায়। যে ফিক্‌হশাস্ত্র

(৮) ইমাম আবু হানীফাহ্‌র প্রধান ছাত্রদের অন্যতম।

(৯) ইমাম মালিকের প্রধান ছাত্র।

(১০) হাস্‌সান ইবরাহীম হাস্‌সান, ইসলাম: এ রিলিজিয়াস, পলিটিকাল, সোশাল এন্ড ইকোনোমিক স্টাডি, (ইরাক: ইউনিভার্সিটি অব বাগদাদ, ১৯৬৭), পৃ. ৩৫৬—৩৭৮।

সাহাবিগণ ও প্রথম যুগের বিশেষজ্ঞদের যুগে এক অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশে বিকশিত হয়েছিল, তা এই পর্যায়ে এসে এদের এসব অপকর্মের কারণে দরবারি বিতর্কের এক হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়।

কথিত এসব 'আলিমদের এই দরবারি বিতর্ক প্রতিযোগিতার মানসিকতা গোঁড়ামিরও জন্ম দেয়। কারণ, বিতর্কে হেরে যাওয়া ব্যক্তি কেবল খলীফার পক্ষ থেকে নির্ধারিত পুরস্কারই নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানও হারাত। এমনকি ব্যক্তিগত সম্মানহানির মধ্য দিয়ে তাঁর মাযহাবেরও সুনামহানি ঘটত। সঠিক হোক বা ভুল হোক এই 'আলিমরা সর্বাবস্থায় নিজের মাযহাবের মতকে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকত। ফলে, মাযহাবকেন্দ্রিক দলাদলি দরবারি 'আলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

৩. হাদীস সংকলন

এ পর্যায়ে হাদীস সংকলন ও যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শুধু মাযহাবি মতামতের উপর নির্ভর না করে একদল 'আলিম সুন্নাহর আলোকে ফিকহি সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন। অন্য কথায়, নিছক প্রখ্যাত কোনো 'আলিমের মত বলেই তা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে—এমন ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে তাঁরা অনেকটা সরে আসেন। যথাসম্ভব হাদীসের উপর নির্ভর করার মাধ্যমে তাঁরা প্রথম যুগের মহান ইমামদের নমনীয়তার ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ফিকহি সমস্যা সমাধানে তাঁরা যথাসাধ্য বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। ইমাম বুখারি (১৯৪-২৫৬ হিজরি) ও ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হিজরি) এর মতো প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে নাবি ﷺ-এর নির্ভরযোগ্য হাদীস ও সাহাবাগণের আসার সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অনেক শ্রম ও সাধনা করেছেন। ফিকহি গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস অনুযায়ী তাঁরা হাদীস ও আসারগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার এই ধারাটির উদ্যোক্তা ছিলেন ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবাল। তিনি

আল মুসনাদ(১১) শিরোনামে হাদীসের সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থটি সংকলন করেন। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়েই ছিলেন তাঁর ছাত্রদের অন্যতম।(১২)

৪. ফিক্‌হ বিন্যাস

গ্রিস, রোম, পারস্য ও ভারতের(১৩) বিজ্ঞান ও দর্শনবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদের ফলে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ যুক্তি উপস্থাপন ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নতুন নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করেন। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা ফিক্‌হশাস্ত্রকে মূলনীতি (উসূল) ও শাখা (ফুরূ')—এ দু'ভাগে বিন্যস্ত করেছিলেন। সময় পরিক্রমায় এর প্রভাবেই তাফসীর , হাদীস এবং নাহ্ও (ব্যাকরণ) প্রভৃতি বিষয়গুলো ইসলামি শিক্ষার এক একটি বিশেষ শাখায় উন্নীত হয়।

এ যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞদের মতামতও সংকলন করা হয়। পাশাপাশি ইসলামি আইনের প্রাথমিক উৎসগুলো শনাক্ত করে সেগুলোকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।(১৪)

ইসলামি আইনের উৎস

১. আল-কুর'আন

কুর'আনই হলো ইসলামি আইনের সর্বপ্রধান উৎস। এর প্রতিটি আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং নির্ভুল। তবে, এর কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে 'আলিমদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

---

(১১) তাঁর এই হাদীসগ্রন্থে বর্ণনাকারী সাহাবিদের নামের বর্ণমালাক্রম অনুযায়ী হাদীসগুলোকে সাজানো হয়েছে।

(১২) আল-মাদখাল, পৃ. ১৩৩।

(১৩) এ যুগের প্রথমার্ধেই (১৩২–২১৫ হিজরি) অধিকাংশ অনুবাদ সম্পন্ন হয়, তবে তার প্রভাব প্রকটভাবে অনুভূত হয় এ যুগের শেষার্ধে।

(১৪) আল-মাদখাল, পৃ. ১২৮–১৩৪।

২. আস-সুন্নাহ

গুরুত্বের দিক থেকে কুর'আনের পরের অবস্থানে রয়েছে নাবি ﷺ-এর হাদীসগুলো। তবে, নাবি ﷺ-এর বিশুদ্ধ হাদীস ছাড়াও দুর্বল ও হাদীস জালকারীদের রচিত বেশ কিছু বানোয়াট হাদীসও প্রচলিত আছে। তাই বিশেষজ্ঞগণ হাদীস গ্রহণ ও প্রয়োগের জন্য বিশুদ্ধতার মানদণ্ড হিসেবে কিছু শর্ত আরোপ করে দিয়েছেন।

৩. সহাবাগণের মতামত

সহাবিদের ব্যক্তিগত মতামত ও ইজমা' হলো আইনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাঁদের মতগুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

ক. কোনো বিষয়ে তাঁরা সকলে একমত পোষণ করলে তাকে ইজমা' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

খ. কোনো বিষয়ে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলে প্রত্যেকটি মতকে বলা হয় রা'ই (রায়) বা ব্যক্তিগত মত।

৪. কিয়াস

গুরুত্বের দিক থেকে এর পরের অবস্থানে রয়েছে কুর'আন-সুন্নাহতে প্রাপ্ত প্রমাণভিত্তিক ইজতিহাদ বা কিয়াস। কিয়াস হলো সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থার ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একটি পদ্ধতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিয়াসের মাধ্যমেই 'আলিমগণ গাঁজা সেবনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। নাবি ﷺ নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেছেন:

"প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্য খাম্‌র; আর প্রত্যেক খাম্‌রই হারাম।"[১৫]

গাঁজার মধ্যে নেশাজাতীয় প্রভাব রয়েছে। তাই এটিও খাম্‌র শ্রেণিভুক্ত এবং হারাম।

---

(১৫) মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১১০৮, হাদীস নং ৪৯৬৩ এবং সুনান আবি দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ. ১০৪৩, হাদীস নং ৩৬৭২।

৫. ইসতিহ্সান (আইনগত প্রাধান্য)

এই নীতির ভিত্তিতে পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো মতকে ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিভিন্ন নামে হলেও এ নীতিটি বেশিরভাগ মাযহাবের বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বস্তু উৎপাদন ও বিক্রিসংক্রান্ত চুক্তিতে ইসতিহ্সান-এর প্রয়োগ দেখা যায়। নাবি ﷺ-এর বক্তব্য,

"দখলে আসার আগ পর্যন্ত খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করা কারও উচিত নয়।"[১৬]

—অনুযায়ী ক্বিয়াস করলে পাওয়া যায়: দখলে আনার আগে কোনো পণ্য বিক্রি করা যাবে না, কারণ এক্ষেত্রে চুক্তির সময় পণ্যটির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তবে, এ ধরনের চুক্তি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং এর প্রয়োজনীয়তাও একেবারে স্পষ্ট। তাই ক্বিয়াসের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ইসতিহ্সান-এর নীতি অনুযায়ী এ ধরনের চুক্তিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

৬. 'উর্ফ (প্রথা)

ইসলামের কোনো মূলনীতি বা বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না-হলে স্থানীয় প্রথাগুলো ঐ অঞ্চলের আইনের একটি উৎস হিসেবে গণ্য হতে পারে। দেনমোহর পরিশোধের ব্যাপারে বিয়ের স্থানীয় প্রথা হলো এর একটি উত্তম উদাহরণ। ইসলামি আইন অনুযায়ী, বিবাহের একটি অংশ হলো পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দেনমোহর নির্ধারণ করা। তবে, দেনমোহর পরিশোধের ব্যাপারে ইসলাম কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়নি। মিশর ও অন্যান্য কিছু এলাকার প্রথা অনুযায়ী মুক্বাদ্দাম নামে দেনমোহরের একটি অংশ বিবাহ অনুষ্ঠানের আগেই পরিশোধ করতে হয়, আর মু'আখ্খার নামক বাকি অংশ কেবল মৃত্যু কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় পরিশোধ করা হয়।[১৭]

---

(১৬) ইব্ন 'উমার থেকে বর্ণিত হ়াদীস়টি সংগ্রহ করেছেন ইমাম মালিক। আল-মুয়াত্ত়া' ইমাম মালিক, পৃ. ২৯৬, হ়াদীস় নং ১৩২৪।

(১৭) মুহ়াম্মাদ মুস়্ত়াফা শালাবি, উস়ুল আল-ফিক্হ আল-ইসলামি, (বৈরুত, লেবানন: দার আন-নাহ্দাহ আল-'আরাবিয়াহ), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮, খণ্ড ১, পৃ. ৩১৪।

‘উর্ফ-এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়াসংক্রান্ত প্রথাগুলো। ইসলামি আইন অনুযায়ী, বিক্রিত পণ্য পুরোপুরি হস্তান্তর করা না হলে মূল্য পরিশোধ জরুরি নয়। তবে, অনেক অঞ্চলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ভাড়াকৃত স্থান বা বস্তুটির অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করতে হয়।

ইসলামি আইনের উৎসগুলোর এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করার উদ্দেশ্য ছিল ইতিবাচক উন্নয়ন সাধন। তবে দলাদলির চলমান ধারার সাথে মিলিত হয়ে এই শ্রেণিবিন্যাস মাযহাবগুলোর পারস্পরিক ব্যবধানকে আরও বৃদ্ধি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে একই নীতিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়ায় তা বরং মতপার্থক্যের উৎসে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মালিকি মাযহাবের ‘আলিমগণ হানাফি মাযহাবের ইসতিহ্সান নীতিকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিলেও মাসালিহ্ মুরসালাহ শিরোনামে তাঁরা সেই একই নীতি প্রয়োগ করেছেন। অন্যদিকে শাফি‘ই মাযহাব উভয় পরিভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে একই নীতি প্রয়োগ করার জন্য ইসতিস্হাব পরিভাষাটি ব্যবহার করেছে।

অধ্যায় সারাংশ

১. এ যুগে ফিক্‌হশাস্ত্র ইসলামি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

২. উমাইয়া শাসনামলের শেষের দিকে যেসব মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছিল সেগুলো এ যুগে বিকশিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে 'আব্বাসি খিলাফাতের সর্বত্র শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।

৩. বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্‌হ বৃহৎ পরিসরে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রথমবারের মতো সফলতার সাথে সংকলিত হয়।

৪. ফিক্‌হ শাস্ত্র সুসংগঠিত হয়ে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়: উসূল (মৌলিক নীতিমালা) ও ফুরূ' (শাখা-প্রশাখা)। ইসলামি আইনের প্রধান উৎসগুলোকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

৫. এ পর্যায়ের শেষের দিকে নাবি ﷺ-এর সব হাদীস্ সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে সংকলিত করা হয়।

৬. এ যুগের প্রথমার্ধে মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতা 'আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক পারস্পরিক মতবিনিময় হতো। তবে, ছাত্রদের দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে কঠোরতা ও গোঁড়ামির একটি প্রবণতা দেখা দেয়, যা ছিল পূর্ববর্তী মহান ইমাম ও বিশেষজ্ঞদের উদার মানসিকতার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামি আইনের বিভিন্ন মাযহাব

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা ফিক্হশাস্ত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাযহাবগুলোর[১] বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। নাবি ﷺ ও তাঁর সহাবিগণের ইজতিহাদের মাধ্যমে ফিক্হশাস্ত্রের ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। সে যুগে কুর'আন ও সুন্নাহ্ই ছিল ইসলামি আইনের একমাত্র উৎস। অন্য কথায়, সে যুগে কেবল একটি মাযহাবই ছিল। আর তা হলো নাবি ﷺ-এর মাযহাব।

পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ, ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার যুগে ফিক্হের মূলনীতি হিসেবে ইজমা'র বিকাশ ঘটে। এ যুগেই কিয়াস তথা ইজতিহাদ ফিক্হ শাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র মূলনীতিতে পরিণত হয়। এ যুগে মাযহাব বলতে মূলত ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার মাযহাবকেই বোঝাত। কারণ, আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খলীফার মতামতই ছিল চূড়ান্ত। তবে, সব আইনগত সিদ্ধান্তই নাবি ﷺ-এর সংরক্ষিত সুন্নাহ্র ভিত্তিতে পরিবর্তনযোগ্য ছিল। ফলে সে যুগে কঠোরতা কিংবা দলাদলির কোনো অবকাশ ছিল না।

উমাইয়া রাজত্বের প্রথম দিকে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ফাকীহ্গণ দুটি প্রধান মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তারা যথাক্রমে আহ্লুর-রা'ই এবং আহ্লুল-হাদীস নামে পরিচিত ছিলেন। শাসনব্যবস্থা খিলাফাহ থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়ার পর খলীফাগণ সুন্নাহ্র উপর নির্ভর করাকে প্রায় ছেড়েই দেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই তাদেরকে আর মাযহাবের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। তখন উল্লিখিত দুটি প্রধান মাযহাব থেকে আরও বেশ কয়েকটি নতুন মাযহাব বিকাশ লাভ করে। বিশেষজ্ঞগণ ও তাঁদের ছাত্রবৃন্দ

---

[১] বিশেষজ্ঞগণ, তাদের ছাত্রবৃন্দ ও তাদের পদ্ধতির অনুসারী বিশেষজ্ঞদের সামগ্রিক আইনগত সিদ্ধান্তগুলো।

উমাইয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য 'আলিমগণ ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের উপর নির্ভর করতেন। উল্লেখ্য যে, উমাইয়া যুগ ও 'আব্বাসি যুগের প্রথমাংশে ফিক্হশাস্ত্রের ছাত্ররা স্বাধীনভাবে প্রায়শ শিক্ষক পরিবর্তন করতেন এবং আইনগত বিষয়ে পরস্পর মত বিনিময় করতেন। এর ফলে আইনগত সিদ্ধান্ত দেওয়া ও মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এ যুগের 'আলিমগণও অত্যন্ত উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

'আব্বাসি শাসনের শেষের দিকে ফিক্হশাস্ত্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে। এ সময়ে মাযহাবের সংখ্যা বেশ কমে আসে এবং রাষ্ট্র কিছু মাযহাবকে অন্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য দেয়। দরবারি বিতর্কের মাধ্যমে আন্তঃমাযহাব দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ফলে বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। 'আব্বাসি খিলাফাহ ধ্বংসের পর ইজতিহাদের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মাযহাবের সংখ্যাও কমে আসে চারটিতে। এ মাযহাবগুলো যেন একেবারে আলাদা সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অনুসারীরা এতটা কঠোরভাবে মাযহাবের অনুসরণ করতে শুরু করে যে, বিভিন্ন মাযহাবের ছোটখাটো মতপার্থক্য নিয়েও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। মাযহাবি গোঁড়ামী ও দলাদলি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়। শারী'আহ্র সর্বকালীন ও সার্বজনীন প্রযোজ্যতা যেহেতু বহুলাংশে নির্ভর করে ইজতিহাদের নীতির উপর, তাই এ গুরুত্বপূর্ণ নীতিটির অনুপস্থিতি ফিক্হশাস্ত্রকে অপ্রত্যাশিত বন্ধ্যাত্ব ও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়।

পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা মাযহাবগুলোর প্রধান ইমাম, মাযহাবের গঠন ও মৌলিক নীতিমালাগুলো আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করব। তারপর, বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে প্রধানত যেসব কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করব।

হানাফি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম আবু হানীফাহ রহিমাহুল্লাহ (৮০–১৫০ হিজরি; ৭০৩–৭৬৭ সাল)

মহান বিশেষজ্ঞ ইমাম আবু হানীফাহ্‌র নামানুসারে হানাফি মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর আসল নাম ছিল নু'মান ইব্‌ন সাবিত। ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফাহ নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ইরানি বংশোদ্ভূত একজন রেশম ব্যবসায়ী। ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার শাসনামলে তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবু হানীফাহ তাঁর প্রাথমিক অধ্যয়ন শুরু করেন 'ইল্‌ম আল-কালাম নামক দর্শন ও আধুনিক ভাষাবিদ্যা শাস্ত্রে। কিন্তু, এর বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তা ছেড়ে দিয়ে তিনি ফিক্‌হ ও হাদীস্‌ শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন যাইদকে তাঁর প্রধান শিক্ষক হিসেবে বেছে নেন। হাম্মাদ ছিলেন ঐ সময়ে হাদীসের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইমাম আবু হানীফাহ আঠারো বছর শিক্ষা লাভ করেন। এ সময়ে তিনি নিজেই শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করেন। তবে হিজরি ১২৪ সালে (৭৪২ সাল) হাম্মাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর ছাত্র হিসেবেই থেকে যান। তারপর চল্লিশ বছর বয়সে আবু হানীফাহ তাঁর শিক্ষকের স্থান লাভ করেন এবং কুফার শ্রেষ্ঠতম বিশেষজ্ঞে পরিণত হন।

তাঁর প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তির কারণে তিনি তৎকালীন উমাইয়া শাসকদের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তারা তাকে কুফার বিচারকের *(কাদি)* আসন গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আর এ কারণে কুফার আমীর (শাসনকর্তা) ইয়াযীদ ইব্‌ন 'উমারের নির্দেশে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে'আব্বাসিদের শাসনামলেও সরকারি পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ কারণে খলীফা আবু জা'ফার আল-মানসুর (শাসনকাল ১৩৬–১৫৮ হিজরি; ৭৫৪–৭৭৫ সাল) এর আদেশে তাঁকে বাগদাদে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৫০ হিজরিতে (৭৬৭ সাল) ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি কারাগারেই ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফাহকে একজন তাবি'ই (সহাবিদের ছাত্র) হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তিনি কয়েকজন সহাবির সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন।[২]

হানাফি মাযহাবের গঠন

ইমাম আবু হানীফাহ্র শিক্ষাদান পদ্ধতির ভিত্তি ছিল শূরা' তথা পারস্পরিক আলোচনা। আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি ছাত্রদের সামনে কোনো একটি সমস্যা উপস্থাপন করতেন। বিষয়টি সমাধানের ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হলে তিনি তা লিপিবদ্ধ করতে বলতেন। ইমাম আবু হানীফাহ ও তাঁর ছাত্রদের পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে আইনগত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হতো। এ কারণে বলা যেতে পারে যে, হানাফি মাযহাব যতটা ইমাম আবু হানীফাহ্র নিজের জ্ঞান গবেষণার ফল, ঠিক ততটাই তাঁর ছাত্রদের পরিশ্রমের ফসল।

সমস্যা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা সম্ভাব্য বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে তার সমাধান বের করতেন। কোনো বিষয়ে আলোচনার শুরুতে তাঁরা বলতেন, 'যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে তার সমাধান কী হবে?'। তাঁদের অনুসৃত এ পদ্ধতির কারণে তাঁরা আহ্লুর-রা'ই নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

হানাফি মাযহাবে আইনের উৎস

হানাফি মাযহাবের প্রথম প্রজন্মের ফাকীহ্গণ নিম্নলিখিত উৎসগুলো থেকে ইসলামি আইনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। নিম্নে গুরুত্বের ক্রমানুসারে এগুলোকে উল্লেখ করা হলো:

[২] আল-মাদখাল, পৃ. ১৭১-১৭২।

১. আল-কুর'আন

হানাফি 'আলিমগণ কুর'আনকে ইসলামি আইনের সর্ব প্রধান ও সম্পূর্ণ নির্ভুল উৎস মনে করেন। বস্তুত, কুর'আনের মাধ্যমেই তারা অন্যান্য উৎসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করে থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য কোনো উৎস কুর'আনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তাকে তাঁরা ভুল মনে করেন।

২. আস-সুন্নাহ

সুন্নাহকে তাঁরা ইসলামি আইনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস সাব্যস্ত করেন; তবে তা ব্যবহারের জন্য হানাফি 'আলিমগণ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন, তাদের শর্তানুসারে হাদীস্ কেবল বিশুদ্ধ (সহীহ্) হলেই চলবে না, আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে হলে হাদীস্‌টিকে অবশ্যই প্রসিদ্ধ (মাশহূর) হতে হবে। হানাফি মায্‌হাবের কেন্দ্র ইরাকে 'আলি ও ইব্‌ন মাস'উদ (রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) সহ অল্প-কিছুসংখ্যক সহাবি বসবাস করতেন। উপরন্তু ঐ এলাকায় হাদীস্ জালকারীদের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের কারণে মিথ্যা হাদীস্‌কে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এরূপ শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

৩. সহাবিগণের ইজমা'

ইসলামি আইনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল সহাবিগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ, কুর'আন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়নি এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবু হানীফাহ ও তাঁর ছাত্রদের মতের উপর সহাবিগণের ইজমা'কে প্রাধান্য দেওয়া হতো। হানাফি মায্‌হাব যেকোনো যুগের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের ইজমা'কে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয় এবং মুসলিমদের উপর তা বাধ্যতামূলক মনে করে।

৪. সহাবিগণের ব্যক্তিগত মত

কিছু কিছু বিষয়ে সহাবিগণের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল, তাই সেসব বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইমাম আবু হানীফাহ এ ধরনের ক্ষেত্রে সহাবিগণের বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করে সর্বাধিক উপযুক্ত

মতটি বেছে নিতেন। তিনি তাঁর নিজের মতের উপর সহাবিগণের মতকে সব সময় প্রাধান্য দিতেন। এভাবে তিনি সহাবিগণের মতের অনুসরণকে তাঁর মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩] তবে, তাঁদের একাধিক মত থাকলে তা থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য তিনি সীমিত ক্ষেত্রে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতেন।

৫. কিয়াস

উপরোক্ত উৎসগুলোর কোথাও কোনো সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া না গেলে ইমাম আবু হানীফাহ সহাবিদের ছাত্রদের (তাবি'উন) মত মেনে নেওয়াকে বাধ্যতামূলক মনে করতেন না। তিনি নিজেকে তাবি'উনদের সমকক্ষ মনে করতেন এবং তিনি নিজের ও তাঁর ছাত্রবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত কিয়াসের নীতিমালার ভিত্তিতে নিজেই ইজতিহাদ করতেন।

৬. ইসতিহসান

ইসতিহসান হলো কোনো পরিস্থিতির জন্য অধিক উপযুক্ত মনে হওয়ার কারণে তুলনামূলক দুর্বল একটি প্রমাণকে অপর কোনো শক্তিশালী প্রমাণের উপর প্রাধান্য দেওয়া। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে একটি খাস তথা সুনির্দিষ্ট হাদীসকে একটি 'আম বা সাধারণ হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে। অথবা অধিক উপযুক্ত আইনকে কিয়াসের মাধ্যমে প্রাপ্ত আইনের উপর প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

৭. 'উরফ (স্থানীয় প্রথা)

এ নীতির আলোকে যেসব ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যতামূলক ইসলামি প্রথা নেই, সেখানে স্থানীয় প্রথাগুলোকেই আইনগত মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। এ মূলনীতি প্রয়োগের কারণেই মুসলিম বিশ্বের বহু সংস্কৃতিতে প্রাপ্ত

[৩] মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা, তারীখ আল-ফিকহ আল-ইসলামি, (কায়রো, দার আল-কিতাব আল-'আরাবি), ১৯৫৫, খণ্ড ৩, পৃ. ৬২।

রকমারি প্রথাগুলো আইন ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে এবং ভুলক্রমে অনেক সময় এগুলোকে 'ইসলামি' প্রথা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪]

হানাফি মাযহাবের প্রধান ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আবু হানীফাহ্র সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ হলেন যুফার ইব্ন আল-হুযাইল, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান।

যুফার ইব্ন হুযাইল (১১০–১৫৮ হিজরি; ৭৩২–৭৭৪ সাল)

ইমাম যুফার সারা জীবন তাঁর শিক্ষক ইমাম আবু হানীফাহ্র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গিয়েছেন। অনেক আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করেননি। তিনি শিক্ষকতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে বাস্রায় ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবু ইউসুফ ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম (১১৩–১৮২ হিজরি; ৭৩৫–৭৯৫ সাল)

ইমাম আবু ইউসুফ কুফার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীসের ব্যাপক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি হাদীস্শাস্ত্রের একজন উল্লেখযোগ্য বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। অতঃপর তিনি কুফাতে ইমাম ইব্ন আবি লাইলার (মৃত্যু ১৪৮ হিজরি; ৭৬৫ সাল) তত্ত্বাবধানে নয় বছর ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। আবু লাইলার পিতা ছিলেন মাদীনার একজন বিখ্যাত সাহাবি। আবু ইউসুফ পরবর্তীকালে ইমাম আবু হানীফাহ্র তত্ত্বাবধানে নয় বছর অধ্যয়ন করেন। আবু হানীফাহ্র ইন্তেকালের পর তিনি মাদীনায় গিয়ে অল্প সময়ের জন্য ইমাম মালিকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন।

'আব্বাসি খলীফা আল-মাহদি (১৫৮–১৬৮ হিজরি; ৭৭৫–৭৮৫ সাল) ও হারূন আর-রাশীদ (১৭০–১৯৩ হিজরি; ৭৮৬–৮০৯ সাল)

[৪] আল-মাদখাল, পৃ. ১৭৫-১৮৬।

আবু ইঊসুফকে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। প্রধান বিচারপতির ক্ষমতাবলে তিনি বিভিন্ন শহরের বিচারক নিয়োগ দিতেন। তাঁর নিয়োগপ্রাপ্ত সবাই ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী। এভাবে, তিনি মুসলিম সাম্রাজ্য জুড়ে এ মাযহাবের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫]

মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান শায়বানি (১৩২–১৮৯ হিজরি; ৭৪৯–৮০৫ সাল)

ইমাম মুহাম্মাদ ইরাকের ওয়াসিতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি বড় হয়েছেন কুফাহ নগরীতে। আবু ইঊসুফের মতো তিনিও প্রথমে হাদীস্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইমাম আবু হানীফাহ্‌র মৃত্যুর পূর্বে তিনি অল্প সময়ের জন্য তাঁর তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জন করেন। তারপর তিনি আবু ইঊসুফের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন চালিয়ে যান এবং পরবর্তীকালে মাদীনায় গিয়ে ইমাম মালিকের নিকট তিন বছর পড়াশোনা করেন। এ সময়ে তিনি ইমাম মালিকের হাদীস্ গ্রন্থ আল-মুয়াত্তা'র অন্যতম বর্ণনাকারীতে পরিণত হন। পরবর্তী সময়ে বাগদাদে ইমাম শাফি'ই সহ আরও অনেক বিশেষজ্ঞই মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসানের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসানও খলীফা হারূন আর-রাশীদের শাসনামলে বিচারকের (কাদি) পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে, বিচারকের পদে থাকলে অনেক বিষয়ে আপস করতে হয়, তাই অল্প দিনের মধ্যে তিনি ঐ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বাগদাদে তাঁর শিক্ষকতায় ফিরে আসেন।

হানাফি মাযহাবের অনুসারীবৃন্দ

বর্তমানে হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, গায়ানা, ত্রিনিদাদ, সুরিনামে বসবাস করে। মিশরেও এ মাযহাবের কিছু অনুসারী দেখা যায়।

[৫] শাহ ওয়ালীউল্লাহ দাহলাউই, আল ইনসাফ ফী বায়ান আসবাব আল-ইখতিলাফ, (বৈরুত, লেবানন, দার আন-নাফাইস), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ৩৯।

উনবিংশ শতাব্দিতে 'উস্‌মানি শাসকবৃন্দ হানাফি মায্‌হাবের আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করেন। তখন বিচারক পদে নিয়োগ প্রত্যাশী সব বিশেষজ্ঞ এ মায্‌হাবের আইনশাস্ত্র শিখতে বাধ্য হন। এভাবেই উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে এ মায্‌হাব 'উস্‌মানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

আওযা'ই মায্‌হাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম আওযা'ই রহিমাহুল্লাহ (৮৮—১৫৭ হিজরি; ৭০৮—৭৭৪ সাল)

এ মায্‌হাবটির নামকরণ করা হয় বিশেষজ্ঞ 'আলিম আব্দুর-রহ্‌মান ইব্‌ন আল-আওযা'ইর নামানুসারে। তিনি ৮৯ হিজরিতে লেবাননের বা'লাবাক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। হিজরি দ্বিতীয় শতকের একজন প্রখ্যাত হাদীস্‌ বিশারদ হিসেবে তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। কুর'আন অথবা সুন্নাহতে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে এমন বিষয়ে তিনি কিয়াস ও অন্যান্য যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতির অতিরিক্ত প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি বৈরুতে কাটালেও তাঁর মায্‌হাব সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন ও স্পেনে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৫৭ হিজরিতে তিনি বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

মাযহাবটির বিলুপ্তির কারণ:

দশম শতকে শাফি'ই মায্‌হাবের অনুসারী আবু যার'আহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উস্‌মান দামেশকের বিচারক নিযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আওযা'ই মায্‌হাবই ছিল সিরিয়ার প্রধান মায্‌হাব। আবু যার'আহ শাফি'ই মায্‌হাবের গ্রন্থ, মুখতাস্‌র আল-মুযানি (শাফি'ই ফিক্‌হের একটি বই) মুখস্থকারী প্রত্যেককে একশ দিনার পুরস্কার প্রদান করার প্রথা চালু করেন। ফলে সিরিয়াতে শাফি'ই মায্‌হাব এত দ্রুত সম্প্রসারিত হয় যে, আওযা'ইর অনুসারীর সংখ্যা কমে আসতে থাকে। একাদশ শতাব্দিতে সেটা নেমে আসে শূন্যের

কোঠায়। তবে এরপরেও ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অবদান তুলনামূলক ফিক্‌হের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়।[৬]

মালিকি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ (৯৩–১৭৯ হিজরি; ৭১৭–৮০১ সাল)

এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বিশেষজ্ঞ মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন 'আমির ৯৩ হিজরিতে মাদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা 'আমির ছিলেন মাদীনার প্রধান সহাবিদের অন্যতম। হাদীসের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ইমাম আয-যুহরি ও বিখ্যাত হাদীস্ বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমারের আযাদকৃত গোলাম নাফি'র তত্ত্বাবধানে ইমাম মালিক হাদীস্ অধ্যয়ন করেন। কেবল হাজ্জের উদ্দেশ্য ব্যতীত তিনি কখনো মাদীনার বাইরে ভ্রমণ করতেন না। ফলে, তাঁর জ্ঞান অনেকাংশে মাদীনায় প্রাপ্ত হাদীসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

'আব্বাসি শাসকদের সরকারি আইনে বলা হয়েছিল, কোনো ব্যক্তি খলীফার আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করলে অবধারিতভাবে তার স্ত্রী তলাক হয়ে যাবে। ইমাম মালিক সরকারি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার কারণে ১৪৭ হিজরিতে (৭৬৪ সাল) মাদীনার শাসকের নির্দেশে তাঁকে মারাত্মকভাবে নির্যাতন করা হয়। ইমাম মালিককে বেঁধে এমনভাবে প্রহার করা হয়েছিল যে, তাঁর হাত মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। কিছু কিছু বর্ণনায় আছে যে, ঐ আঘাতের ফলে তিনি সলাতে তাঁর হাত বুকের উপর রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং হাত ছেড়ে দিয়েই সলাত আদায় করেন।

ইমাম মালিক মাদীনাতে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাদীসের পাঠ দান করেন। তিনি আল-মুয়াত্তা' নামে নাবি ﷺ-এর হাদীস্ এবং

[৬] আল-মাদখাল, পৃ. ২০৫-২০৬। আরও দেখুন 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল- জাবুরি, ফিক্‌হ আল ইমাম আওযা'ই, (ইরাক, মাতবা'আহ আল-ইরশাদ), ১৯৭৭।

স়হাবি ও তাবি'ঊনদের আস়ার সম্বলিত একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। 'আব্বাসি খলীফা আবু জা'ফার আল-মানসূর (শাসনকাল ১৩৬–১৫৮ হিজরি; ৭১৭–৮০১ সাল) নাবি ﷺ-এর সুন্নাহভিত্তিক একটি সার্বজনীন সংবিধান চেয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধেই ইমাম মালিক হ়াদীস় সংকলনের এই কাজ শুরু করেন। তবে, গ্রন্থের সংকলন সমাপ্ত হওয়ার পর ইমাম মালিক গ্রন্থটিকে সকলের উপর বাধ্যতামূলক করে দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি বলেন যে, স়হাবিগণ ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা নিশ্চয় সুন্নাহ্‌র এমন বিষয় জানেন, যা তার এই গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। তাই রাষ্ট্রে সার্বজনীন কোনো আইন জারির ক্ষেত্রে সেগুলোকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

খলীফা হারূন আর-রাশীদও ইমাম মালিককে একই অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবকেও তিনি নাকচ করে দেন। ১৭৯ হিজরিতে (৮০১ সাল) ৮৭ বছর বয়সে ইমাম মালিক তার জন্মস্থান মাদীনায় ইন্তেকাল করেন।[৭]

মালিকি মাযহাবের গঠন

ইমাম মালিকের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল হ়াদীস় বর্ণনা করা ও সমকালীন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত হ়াদীসের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা। তিনি ইসলামি আইনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর হ়াদীস় ও আস়ার বর্ণনা করে তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর ছাত্রদের নিজ নিজ এলাকায় উদ্ভূত সমস্যাগুলোও আলোচনা করে তার সমাধানকল্পে যথোপযুক্ত হ়াদীস় অথবা আস়ার বর্ণনা করতেন।

আল-মুয়াত্‌ত়া' রচনা সমাপ্ত করার পর তিনি তা নিজ মায্‌হাব হিসেবে তাঁর ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন। তবে, নতুন কোনো বিশুদ্ধ তথ্য পাওয়া গেলে তিনি প্রয়োজনে তাতে সংযোজন ও বিয়োজন করতেন। তিনি সবসময়ই কল্পনা ও কল্পনাপ্রসূত ফিক্‌হকে এড়িয়ে চলতেন। আর এভাবে তাঁর মায্‌হাব ও অনুসারীবৃন্দ আহ্‌লুল-হ়াদীস় নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

[৭] আল-মাদখাল, পৃ. ১৮৪-১৮৭।

মালিকি মাযহাবে আইনের উৎস

ইমাম মালিক নিম্নলিখিত উৎসগুলো থেকে ইসলামি আইন বের করে আনতেন। গুরুত্বের ক্রমধারা অনুযায়ী নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. আল-কুর'আন

অন্যান্য ইমামদের মতো ইমাম মালিকও কুর'আনকে ইসলামি আইনের প্রধান উৎস মনে করতেন। এর প্রয়োগে তিনি কোনো পূর্বশর্ত আরোপ করেননি।

২. সুন্নাহ

সুন্নাহকে ইমাম মালিক ইসলামি আইনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে, ইমাম আবু হানীফাহ্র মতো তিনিও হাদীস্ ব্যবহারের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। কোনো হাদীস্ মাদীনার প্রথার পরিপন্থী হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

তিনি অবশ্য ইমাম আবু হানীফাহ-র মতো হাদীস্টি মাশহূর বা সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার উপর জোর দেননি। বরং হাদীসের বর্ণনাকারীদের কেউ পরিচিত মিথ্যুক কিংবা চরম দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী না হলে প্রত্যেকটি হাদীস্কে তিনি গ্রহণ করতেন।

৩. মাদীনাবাসীর 'আমাল

মাদীনাবাসীদের অনেকেই সাহাবিগণের সরাসরি বংশধর। মাদীনাতেই নাবি ﷺ তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর কাটিয়েছেন। তাই ইমাম মালিকের যুক্তি অনুযায়ী, মাদীনার সাধারণ সব অভ্যাসই অনুমোদিত। কারণ, যদি তা না হতো তবে নাবি ﷺ নিশ্চয়ই এগুলোকে নিরুৎসাহিত করতেন।

এভাবে ইমাম মালিক মাদীনাবাসীর সাধারণ প্রথাকে নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ্‌র একটি প্রকার হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যা কথা নয় বরং কাজের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।[৮]

৪. সাহাবিদের ইজমা'

ইমাম আবু হানীফাহ্‌র মতো ইমাম মালিকও সাহাবিগণ ও পরবর্তী যুগের বিশেষজ্ঞদের ইজমা'কে ইসলামি আইনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে করতেন।

৫. সাহাবিদের ব্যক্তিগত অভিমত

ইমাম মালিক সাহাবিগণের ঐক্যমত্য বা মতপার্থক্যপূর্ণ উভয় মতামতকেই পূর্ণমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে তাঁর হাদীস্ গ্রন্থ আল-মুয়াত্তা'য় সন্নিবেশিত করেছেন। তবে, সাহাবিদের মতৈক্যকে তাঁদের ব্যক্তিগত মতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

কোনো বিষয়ে ঐকমত্য না থাকলে, তাঁদের ব্যক্তিগত মতকেও ইমাম মালিক তাঁর নিজের মতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৬. কিয়াস

উল্লিখিত উৎসগুলোতে কোনো বিষয় না পাওয়া গেলে ইমাম মালিক তাঁর নিজ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কারণ, এ ধরনের মতামত একান্তই ব্যক্তিগত।

৭. মাদীনাবাসীদের প্রথা

হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে ইমাম মালিক মাদীনার কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত প্রথাগুলোকেও কিছুটা গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে,

---

[৮] মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ, তারীখ আল- মাযাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ, (কায়রো, দার আল-ফিক্‌র আল-'আরাবি), খণ্ড ২, পৃ. ২১৬-২১৭।

এসব প্রথা বিচ্ছিন্ন হলেও সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে যে, তা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং সাহাবিগণ কিংবা নাবি ﷺ নিজে এগুলোকে সমর্থন করেছেন।

৮. ইসতিসলাহ্

ইমাম আবু হানীফাহ-র উদ্ভাবিত ইসতিহ্সান নীতিটি ইমাম মালিক ও তাঁর ছাত্ররাও প্রয়োগ করেছেন। তবে, তাঁরা নীতিটির নাম দিয়েছেন ইসতিসলাহ্। এর সরল অর্থ হলো অধিক উপযুক্ত আইনগত সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করা। মানুষের জন্য কল্যাণকর অথচ তা শারী'আহয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসতিসলাহ্ নীতিটি প্রযোজ্য।

'আলি ﷺ-এর একটি আইনগত সিদ্ধান্তে ইসতিসলাহ্-এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। সংঘবদ্ধ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী দলের সবাই দোষী যদিও প্রকৃত হত্যাকাণ্ডটি হয়তো তাদের মধ্য থেকে মাত্র একজনই ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে শারী'আহ আইনে কেবল মূল হত্যাকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ হলো, রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী শাসক ধনী মানুষের নিকট থেকে যাকাতের পাশাপাশি অন্যান্য কর আদায় করতে পারবে। অথচ, শারী'আহ্তে কেবল যাকাতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিয়াসের পরিবর্তে পরিস্থিতির সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইমাম মালিকও ইসতিসলাহ্ নীতিটি ব্যবহার করেছেন।

৯. 'উর্ফ (প্রথা)

ইমাম আবু হানীফাহ্র মতো ইমাম মালিকও শারী'আহ্র সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতিগুলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আইনের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[৯]

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিরিয়ার আঞ্চলিক প্রথা অনুযায়ী দাব্বাহ শব্দ দ্বারা ঘোড়াকে বোঝায়। অথচ, আরবি ভাষায় এর সরল অর্থ হলো চতুষ্পদী জন্তু। অতএব, সিরিয়ার কোনো চুক্তিতে দাব্বাহ পরিশোধের শর্ত দেওয়া হলে তার অর্থ

---

[৯] আল-মাদখাল, পৃ. ১৮৭।

হবে 'ঘোড়া'। পক্ষান্তরে, আরব বিশ্বের অন্য কোথাও দাব্বাহ শব্দটি দ্বারা ঘোড়া বোঝাতে চাইলে আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

মালিকি মাযহাবের প্রধান ছাত্ররা

ইমাম মালিক-এর যেসব ছাত্র পরবর্তীতে নিজেদের আলাদা কোনো মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেননি তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন আল-কাসিম ও ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ।

আবু আব্দুর-রহমান ইব্‌ন আল-কাসিম (১৩২–১৯১ হিজরি; ৭৪৫–৮১৩ সাল)

ইমাম কাসিমের জন্ম মিশরে। পরবর্তীকালে তিনি মাদীনায় ভ্রমণ করে তাঁর শিক্ষক ইমাম মালিকের তত্ত্বাবধানে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অধ্যয়ন করেন। মালিকি মাযহাবের ফিক্‌হের উপর তিনি আল- মুদাওওয়ানাহ নামক একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, তা ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা'কেও অনেকটা ম্লান করে দেয়।

আবু 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (১২৫–১৯৭ হিজরি; ৭৪২–৮১৯ সাল)

ইমাম ইব্‌ন ওয়াহ্‌বও ইমাম মালিকের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করার জন্য মিশর থেকে মাদীনায় গমন করেছিলেন। তিনি কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলাহ বের করার ক্ষেত্রে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে, খোদ ইমাম মালিক তাঁকে আল-মুফতি উপাধি দিয়েছিলেন।

ইব্‌ন ওয়াহ্‌বকে মিশরের বিচারক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, শাসকের ইচ্ছার অধীনস্থ না হয়ে স্বাধীনভাবে নিজের সততাকে ধরে রাখার জন্য তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[১০]

[১০] আল-মাদখাল, পৃ. ১৮৭।

অন্যান্য মাযহাবের প্রখ্যাত 'আলিমদের মধ্যেও ইমাম মালিকের বেশ কিছু ছাত্র রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইমাম মালিকের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ নিজ মাযহাবে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করেছেন। যেমন, ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হাসান শায়বানি । তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফাহ্‌র প্রথম সারির একজন ছাত্র।

আবার কিছু বিশেষজ্ঞ ইমাম মালিকের শিক্ষাকে অন্যদের শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে নিজেদের পৃথক মাযহাব তৈরি করেছেন, যেমন ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস শাফি'ই। তিনি বহু বছর যাবৎ ইমাম মালিক ও আবু হানীফাহ্‌র ছাত্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হাসান শায়বানির নিকট অধ্যয়ন করেছেন।

মালিকি মাযহাবের অনুসারী

বর্তমানে এ মাযহাবের অনুসারীদের বেশিরভাগই বসবাস করে মিশর, সুদান, উত্তর আফ্রিকা (তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো), পশ্চিম আফ্রিকা (মালি, নাইজেরিয়া ও চাদ প্রভৃতি) এবং আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতে (কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন)।

যাইদি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম যাইদ রহিমাহুল্লাহ (৮১–১২২ হিজরি; ৭০০–৭৪০ সাল)

'আলি ﷺ-এর বংশধর হুসাইনের এক দৌহিত্রের মাধ্যমে এ মাযহাবের উৎপত্তি। ইমাম যাইদের পিতা 'আলি যাইন আল-'আবিদীন আইন শাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান ও হাদীস বর্ণনার কারণে সুপরিচিত ছিলেন। ৮১ হিজরিতে মাদীনায় জন্মগ্রহণকারী যাইদ ইব্ন 'আলি অল্প সময়ের মধ্যেই 'আলাউই বংশের প্রথম সারির একজন বিশেষজ্ঞ 'আলিমে পরিণত হন। তাঁর বড় ভাই মুহাম্মাদ আল-বাকির[১১]সহ অন্যান্য অনেক আত্মীয়ের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইরাকের কুফাহ, বাসরাহ ও ওয়াসিতের অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে ভ্রমণের মাধ্যমে ইমাম যাইদ তাঁর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। ওয়াসিতে তিনি ইমাম আবু হানীফাহ ও সুফ্য়ান আস্-সাওরির মতো সমকালীন বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

উমাইয়া খলীফা হিশাম ইব্ন আব্দিল মালিক (শাসনকাল ১০৫–১২৫ হিজরি; ৭২৪–৭৪৩ সাল) 'আলাউই পরিবারকে খাটো ও অপমানিত করার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতেন না। বিশেষত যাইদ ইব্ন 'আলীকে প্রায়ই অপমান করা হতো। গভর্নরের অনুমতি ছাড়া তাঁকে মাদীনার বাইরে যেতে দেওয়া হতো না। অনুমতি চাইলেও তা প্রত্যাখ্যান করা হতো। এমতাবস্থায়, ইমাম যায়্দই হলেন 'আলির বংশের প্রথম ব্যক্তি যিনি কারবালার বিপর্যয়ের পর উমাইয়াদের কাছ থেকে খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন।

তিনি গোপনে কুফাহ গমন করেন। সেখানে ইরাকের ওয়াসিত ও অন্যান্য এলাকার শী'আরা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তবে তাঁর কিছু আত্মীয় কুফাবাসীদের উপর আস্থা রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ ইমাম হুসাইনের সাথে তাদের

[১১] শী'আদের উপস্থাপিত বারো ইমামের পঞ্চমজন।

বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, তিনি তাদের সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেননি।

ইমাম যাইদের নব্য অনুসারীরা অনুসন্ধান করে বের করল যে, তাঁর পিতামহের কাছ থেকে খিলাফাহ 'চুরির' অভিযোগে প্রথম খলীফাদ্বয় আবু বাক্‌র ও 'উমারকে তিনি মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী মনে করেন না। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা দেয়। অধিকাংশ অনুসারীরাই তাঁর কাছ থেকে কেটে পড়ে এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর ভাতিজা জা'ফার আস-সাদিক্বকে যুগের ইমাম ঘোষণা করে। খলীফা হিশামের সেনাবাহিনী এ মতবিরোধের সদ্ব্যবহার করে অতর্কিত কুফাহ আক্রমণ করে। মাত্র চার শ'র সামান্য কিছু বেশি অনুসারী ইমাম যাইদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।[১২]

যায়দি মাযহাবের গঠন

ইমাম যাইদ ছিলেন প্রধানত হাদীস্ বর্ণনা ও কুর'আন তিলাওয়াতে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। মাদীনা, বাসরাহ, কুফাহ ও ওয়াসিতের শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে তিনি পাঠদান করতেন। এর ফলে তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনেক। ইমাম যাইদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল হাদীস্ বর্ণনা ও কুর'আন তিলাওয়াহ শিখানো।

আইনগত প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি নিজে তার সমাধান দিতেন, অথবা ফাকীহ্ আবদুর-রহমান ইবন আবি লাইলার মতো সমসাময়িক বিশেষজ্ঞদের কোনো একজনের মতকে বেছে নিতেন। মাযহাবের আইনগত সিদ্ধান্তগুলো ইমাম যাইদ নিজে লিপিবদ্ধ করেননি এবং তিনি কাউকে তা করার নির্দেশও দেননি। তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিজ উদ্যোগে সেসব সিদ্ধান্ত সংকলন করেছেন।

[১২] তারীখ আল-মাযহাব আল-ইসলামিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৭৪৯–৭৯৩।

যায়দি মাযহাবে আইনের উৎস

এ মাযহাবের আইন বিশেষজ্ঞগণের মতে, ইমাম যাইদ নিম্নোক্ত উৎসগুলো থেকে আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তার মাযহাবের পরবর্তী 'আলিমগণও এসব উৎস থেকেই আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

১. আল-কুর'আন

কুর'আনকে ইসলামি আইনের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বিদ্যমান ত্রিশ জুয (পারা) কুর'আনকেই সম্পূর্ণ মনে করা হতো। অনেক চরমপন্থী শী'আহ গোষ্ঠী কুর'আনের কিছু অংশ মুছে ফেলা বা লুকিয়ে রাখার যে অভিযোগ উত্থাপন করে, তার সাথে তাঁরা একমত পোষণ করতেন না।

২. সুন্নাহ

নাবি ﷺ-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে ইসলামি আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হতো। 'আলাউই পরিবার কিংবা তাদের অনুসারীদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সীমিত না রেখে সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকে যায়দি মাযহাবে সুন্নাহ মনে করা হতো।

৩. 'আলি رضي الله عنه-এর বক্তব্য

একান্তই ব্যক্তিগত মত ছাড়া 'আলি ইব্ন আবি তালিবের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যকে ইমাম যাইদ সুন্নাহ্র অংশ মনে করতেন। অর্থাৎ, কোনো বক্তব্যের ক্ষেত্রে 'আলি رضي الله عنه যদি বিশেষভাবে সেটিকে একান্ত নিজের মত বলে উল্লেখ না করতেন, তাহলে ইমাম যাইদ ধরেই নিতেন যে, তা নাবি ﷺ-এর মত। তবে, 'আলির সব সিদ্ধান্তকেই যে তিনি গ্রহণ করতেন তা নয়। বরং মাঝে মধ্যে তিনি 'আলির সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্তও দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্ণিত আছে যে, 'আলি رضي الله عنه-এর মতে ইয়াতিমের নিকট থেকে যাকাত আদায় করা যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম যাইদ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, ইয়াতিমের নিকট থেকে যাকাত আদায় করা যাবে না।

৪. সাহাবিগণের ইজমা'

ইমাম যাইদ সাহাবিগণের ইজমা'কে ইসলামি আইনের একটি উৎস মনে করতেন। তবে আবু বাক্‌র ও 'উমারের তুলনায় তিনি তাঁর পিতামহকে নেতৃত্বের জন্য অধিক উপযুক্ত মনে করতেন। তথাপিও তাঁদের খিলাফাতকে যেহেতু সাহাবিগণ সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই তিনিও তা মেনে নেওয়া সকলের উপর বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করতেন।

৫. কিয়াস

এ মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, ইসতিহসান ও ইসতিসলাহ্ শীর্ষক উভয় নীতিই এক প্রকার কিয়াস। তাই, এ নীতিগুলোকে তাঁরা অন্যান্য মাযহাবের কিয়াসেরই একটি অংশ মনে করতেন।

৬. 'আকল (বুদ্ধিমত্তা)

যেসব ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী উৎসগুলোতে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না সেসবক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে এ মাযহাবের ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যুবক বয়সে ইমাম যাইদ মু'তাযিলি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইব্‌ন 'আতার তত্ত্বাবধানে কিছু দিন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মু'তাযিলিরাই সর্বপ্রথম'আকল বা বুদ্ধিমত্তাকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের যুক্তি মতে বিবেকবুদ্ধিতে যা ভালো মনে হবে তা-ই ভালো এবং যা মন্দ মনে হবে তা-ই মন্দ। কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র পরেই 'আক্‌লের স্থান। এ কারণেই তারা কিয়াসের পাশাপাশি সাহাবিগণের মতামতকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদিকে, ইমাম যাইদ কিয়াসকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং 'আক্‌লকে স্থান দিয়েছেন সবার শেষে।

যায়দি মাযহাবের প্রধান ছাত্ররা

এ মাযহাব সংরক্ষিত হয়েছে ইমাম যাইদের ছাত্রদের মাধ্যমে। তাঁরা ইমাম যাইদের সিদ্ধান্তগুলোর পাশাপাশি 'আলাউই বংশের অন্যান্য ইমাম এবং

সমসাময়িক অনেক বিশেষজ্ঞের আইনগত সিদ্ধান্তগুলোও তাঁদের সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আবু খালিদ, 'আম্র ইব্ন খালিদ ওয়াসিতি (মৃত্যু ২৭৬ হিজরি; ৮৮৯ সাল)

'আম্র ইব্ন খালিদ সম্ভবত ইমাম যাইদের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন। ইমাম যাইদের সাথে তিনি মাদীনায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন এবং অধিকাংশ সফরে তিনি তাঁর সাথে থাকতেন। 'আম্র দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইমাম যাইদের শিক্ষাগুলো সংকলন করেন। গ্রন্থ দুটি হলো মাজমু' আল-হাদীস্ ও মাজমু' আল-ফিক্হ। এগুলোকে একত্রে বলা হয় আল মাজমু' আল-কাবীর। মাজমু' আল-হাদীস্ গ্রন্থের সকল হাদীস্ই 'আলাউই পরিবারের বর্ণনা থেকে নেওয়া হলেও এর সবগুলো বর্ণনাই সিহাহ্ সিত্তাহ্র বিখ্যাত গ্রন্থগুলোতে রয়েছে।

আল-হাদি ইলা আল-হাক্ক, ইয়াহইয়া ইব্ন আল-হুসাইন (২৪৬–২৯৮ হিজরি; ৮৬০–৯১১ সাল)

যায়দিগণ 'আলাউই বংশের হুসাইনি শাখার সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ আল-কাসিম ইব্ন ইবরাহীম আল-হাসানি (১৭০–২৪৩ হিজরি; ৭৮৭–৮৫৭ সাল)-এর মতামতগুলোও যায়দি মায্হাবে স্থান পেয়েছে। তবে, এ মায্হাবের উপর তাঁর চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন কাসিমের দৌহিত্র আল-হাদি ইলা আল-হাক্ক। তাকে ইয়েমেনের ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি যায়দি মায্হাবের শিক্ষা অনুযায়ী ইয়েমেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এ সময়ে সে অঞ্চলে যায়দি মায্হাবের ভিত্তি এতটাই মজবুত হয়ে গিয়েছিল যে, এর বদৌলতে তা অদ্যাবধি টিকে আছে।

আল-হাসান ইব্ন 'আলি আল হুসাইনি (২৩০–৩০৪ হিজরি; ৮৪৫–৯১৭ সাল)

আল-হাসান ছিলেন হাদির সমসাময়িক। তিনি আন-নাসির আল-কাবীর নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি দাইলাম ও জীলানে যাইদি মাযহাব প্রচার করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর পরবর্তী লোকেরা তাঁকেই যায়দি মাযহাবের পুনর্জাগরক মনে করেন।[১৩]

যায়দি মাযহাবের অনুসারীবৃন্দ

বর্তমানে এ মাযহাবের অনুসারীবৃন্দের অধিকাংশই বসবাস করতেন ইয়েমেনে। এখনও ইয়েমেনের অনেক নাগরিক যায়িদী মাযহাবের অনুসারী।

লাইসি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম আল-লাইস রহিমাহুল্লাহ (৯৭–১৭৫ হিজরি; ৭১৬–৭৯১ সাল)

ইমাম লাইস ইব্ন সা'দের নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে। ৯৭ হিজরিতে পারস্য বংশোদ্ভূত পিতা-মাতার ঘরে ইমাম আল-লাইস মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন ইসলামি জ্ঞানের সব কটি শাখায় ব্যাপক অধ্যয়নের পর তিনি মিশরের প্রধানতম বিশেষজ্ঞ 'আলিমে পরিণত হন। তিনি ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম মালিকের সমসাময়িক ছিলেন। ইমাম মালিকের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে ইসলামি আইনের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মত বিনিময় করেছেন। যেমন, ইমাম মালিক মাদীনার প্রথাকে ইসলামি আইনের একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করতেন, কিন্তু ইমাম আল-লাইস এ মতের বিপক্ষে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করতেন।

---

[১৩] তারীখ আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৫২৫।

মাযহাবটি বিলুপ্তির কারণ

১৭৫ হিজরিতে ইমাম লাইসের ইন্তেকালের কিছুদিন পরই নিম্নলিখিত কারণে এ মাযহাবটির বিলুপ্তি ঘটে:

১. তাঁর আইনগত মতামত, ব্যাখ্যা ও সেগুলোর সমর্থনে কুর'আন, সুন্নাহ ও সাহাবিগণের মতামত থেকে সংগৃহীত প্রমাণগুলোকে তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেননি। এমনকি তাঁর ছাত্রদেরকেও তা লিপিবদ্ধ করার কোনো নির্দেশ দেননি। ফলে, তুলনামূলক ফিক্হশাস্ত্রের আদি গ্রন্থগুলোতে কিছু উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর মাযহাবের তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

২. ইমাম লাইসের ছাত্রের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাছাড়া তাঁদের কেউই বিখ্যাত আইনজ্ঞে পরিণত হননি। আর তাই ইমাম লাইসের মাযহাবকে জনপ্রিয় করে তোলার মতো কোনো প্রভাব সৃষ্টিকারী অবস্থানেও তারা ছিলেন না।

৩. ইমাম লাইসের ইন্তেকালের পরেই ফিক্হশাস্ত্রে অন্যতম অসাধারণ বিশেষজ্ঞ ইমাম শাফি'ই মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মাযহাব ইমাম লাইসের মাযহাবকে প্রতিস্থাপিত করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফি'ই স্বয়ং ইমাম মালিকের কাছে ও ইমাম লাইসের ছাত্রদের কাছে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ইমাম লাইসের ব্যাপারে এমন কথাও বলেছিলেন যে, তিনি ইমাম মালিকের চেয়ে বড় আইনজ্ঞ ছিলেন; তবে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে অবহেলা করেছে।[১৪]

[১৪] আল-মাদখাল, পৃ. ২০৫।

সা্ওরি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম সা্ওরি রহিমাহুল্লাহ (৯৭–১৬১ হিজরি; ৭১৯–৭৭৭ সাল)

ইমাম সুফ্য়ান সা্ওরি ৯৭ হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস্ ও ফিক্হের ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি কুফার প্রধানতম বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। অনেক ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফাহ্র অনুরূপ মত পোষণ করলেও তিনি কিয়াস ও ইসতিহ্সান নীতির বিরোধী ছিলেন।

ইমাম সুফ্য়ান সা্ওরির সাথে 'আব্বাসি রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিদের বেশ কয়েকবার বাদানুবাদ হয়। কারণ, তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী প্রকৃতির মানুষ এবং শারী'আহ পরিপন্থী রাষ্ট্রীয় নীতিতে সমর্থন করার প্রস্তাবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা আল-মানসুর (শাসনকাল ১৩৬–১৫৮ হিজরি; ৭৫৯–৭৪৪ সাল) চিঠির মাধ্যমে ইমাম আস্-সা্ওরিকে কুফার বিচারকের পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। তবে এতে শর্ত দেওয়া হয় যে, তিনি রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো রায় কিংবা মতামত দেবেন না। চিঠিটি পাওয়ার পর ইমাম সা্ওরি তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বিরক্তির সাথে টাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু, এর ফলে শিক্ষকতা ছেড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হন। ১৬০ হিজরিতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করেই ছিলেন।

মাযহাবটির বিলুপ্তির কারণ

এই মাযহাবটি বিলুপ্তির মূল কারণগুলো ছিল:

১. ইমাম সুফ্য়ান আস্-সা্ওরি জীবনের বেশিরভাগ সময়ই আত্মগোপন করে কাটিয়েছেন। তাই তাঁর ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না যারা পরবর্তী সময়ে জ্ঞানী মহলে তাঁর মতামত ছড়িয়ে দিতে পারত।

২. তিনি হাদীস ও তার ব্যাখ্যার এক বিশাল সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। তবে, তিনি তাঁর প্রধান ছাত্র 'আম্মার ইব্‌ন সাইফকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর সকল লেখা যেন মুছে ফেলা হয়, আর কোনোটা মুছে ফেলা সম্ভব না হলে তা যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। 'আম্মার কর্তব্যপরায়ণতার সাথে নিজ শিক্ষকের সব লেখা নষ্ট করে ফেলেন। তবে ইমাম সাওরির অনেক মতামতই অন্যান্য ইমামের ছাত্ররা সংকলন করেছেন। ফলে, সেগুলো আজও অগোছালোভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।[১৫]

শাফি'ই মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম শাফি'ই রহিমাহুল্লাহ (১৫০–২০৪ হিজরি; ৭৬৯–৮২০সাল)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস শাফি'ইর নামানুসারে এই মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে। তিনি ১৫০ হিজরিতে তদানীন্তন শাম এলাকার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের গাজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ইমাম মালিকের তত্ত্বাবধানে ফিক্‌হ ও হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে তিনি বাল্য বয়সেই মাদীনাহ গমন করেন। তিনি ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা' এমনভাবে মুখস্থ করেছিলেন যে, তাঁকে স্মৃতি থেকে হুবহু তা পাঠ করে শুনিয়ে দিতে পারতেন।

১৭৯ হিজরিতে ইমাম মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম শাফি'ই তাঁর তত্ত্বাবধানেই থেকে যান। তারপর তিনি ইয়েমেনে গিয়ে শিক্ষাদান শুরু করেন। ১৮৯ হিজরিতে তাঁর বিরুদ্ধে শী'আহ বিশ্বাসের প্রতি ঝুঁকে পড়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তখন তাঁকে ইয়েমেন থেকে গ্রেফতার করে ইরাকে 'আব্বাসি খলীফা হারূন আর-রাশীদের (শাসনকাল ১৭০–১৯৩ হিজরি; ৭৮৬–৮০৯ সাল) কাছে হাজির করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর 'আকীদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

[১৫] আল-মাদখাল, পৃ. ২০৬-২০৭।

এরপর ইমাম শাফি'ই ইরাকেই থেকে যান এবং ইমাম আবু হানীফাহ্র বিখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসানের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে, ইমাম লাইসের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তিনি মিশরে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন ইমাম আল-লাইস্ ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন। পরে অবশ্য তিনি ইমাম লাইসের ছাত্রদের নিকট থেকে তাঁর মাযহাব অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন। ইমাম শাফি'ই বাকি জীবন মিশরেই কাটিয়ে দেন। তিনি ২০৪ হিজরিতে খলীফা আল-মামূনের (শাসনকাল ১৯৭–২১৭ হিজরি; ৮১৩–৮৩২ সাল) শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।[১৬]

শাফি'ই মাযহাবের গঠন

ইমাম শাফি'ই হিজাযের মালিকি ফিক্হকে ইরাকের হানাফি ফিক্হের সাথে সমন্বিত করে একটি নতুন মাযহাব তৈরি করেন। এরপর তিনি আল-হুজ্জাহ নামক গ্রন্থাকারে নিজ ছাত্রদের সামনে তা উপস্থাপন করেন। এ গ্রন্থটির শ্রুতলিখনের কাজ সম্পন্ন হয় ১৯৪ হিজরিতে (৮১০ সাল) ইরাকে। তাঁর কিছু ছাত্র[১৭] গ্রন্থটিকে মুখস্থ করে অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থ ও তাঁর জ্ঞানচর্চার এ কালকে আল-মাযহাব আল-কাদীম বা পুরাতন মাযহাব নামে অভিহিত করা হয়।

মিশরে পৌঁছানোর পর তাঁর জ্ঞানচর্চার নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়েছিল। সেখানে তিনি ইমাম লাইসের মাযহাব পুরোপুরি আত্মস্থ করে আল-উম্ম্ নামে আরেকটি গ্রন্থের আকারে তাঁর ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর এ গ্রন্থ ও জ্ঞানচর্চার এই কালকে মাযহাব আল-জাদীদ বা নতুন মাযহাব নামে অভিহিত করা হয়। সম্পূর্ণ নতুন কিছু হাদীস্ ও আইনি যুক্তির সাথে পরিচিত হয়ে তিনি তাঁর পূর্বের অনেক সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করেছেন। ইমাম শাফি'ই-ই প্রথম ফিক্হ শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালাকে সুশৃংখলভাবে

---

[১৬] আল-মাদখাল, পৃ. ১৯২।

[১৭] তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হানবালি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহ্মাদ ইব্ন হানবাল ও আবু সাওর মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আবু সাওর ।

উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আর-রিসালাহ নামক গ্রন্থে তিনি এ সকল নীতি আলোচনা করেছেন।

শাফি'ই মাযহাবে আইনের উৎস

১. আল-কুর'আন

ইসলামি আইনের উৎসগুলোর মধ্যে কুর'আনের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ইমাম শাফি'ইও পূর্বের ইমামদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। অন্য ইমামদের মতো তিনিও কুর'আনের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন। তবে, কুর'আনের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন তার উপরও অনেক সময় নির্ভর করতেন।

২. সুন্নাহ

ইমাম শাফি'ই হাদীস্ গ্রহণের জন্য কেবল একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তা হলো হাদীস্টিকে অবশ্যই সহীহ্ হতে হবে। ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম মালিকের আরোপিত অন্য সকল শর্তকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাদীস্ শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখার কারণেও তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

৩. ইজমা'

বেশ কিছু বিষয়ে আদৌ ইজমা' সংঘটিত হয়েছিল কি না তা নিয়ে ইমাম শাফি'ই-র যথেষ্ট সংশয় ছিল। তবে, অল্প যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ইজমা' হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে—তাঁর মতে সেগুলোকে অবশ্যই ইসলামি আইনের তৃতীয় প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৪. সাহাবিদের ব্যক্তিগত মত

ইমাম শাফি'ই সাহাবিদের ব্যক্তিগত মতামতকে এই শর্তে গ্রহণ করছেন যে, সেগুলো পরস্পরবিরোধী হতে পারবে না। কোনো আইনগত বিষয়ে সাহাবিগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে ইমাম আবু হানীফাহ্র মতো তিনিও

মূল উৎস কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী মতকে বেছে নিয়ে বাকিগুলোকে পরিত্যাগ করতেন।

৫. কিয়াস

ইমাম শাফি'ই-র মতে, উল্লিখিত উৎসগুলো থেকে আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিয়াস একটি বৈধ পদ্ধতি। তবে, তিনি এটিকে গুরুত্বের ক্রমধারায় শেষের দিকে স্থান দিয়েছেন। কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত মতকে তিনি সাহাবিগণের মতামতের চেয়ে সবসময় কম গুরুত্ব দিতেন।

৬. ইসতিসহাব

ইমাম শাফি'ই ইমাম আবু হানীফাহ্‌র ইসতিহ্‌সান ও ইমাম মালিকের ইসতিসলাহ্—উভয় নীতিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। এগুলোকে তিনি এক প্রকার বিদ'আত মনে করতেন। তাঁর মতে, এগুলো এমন সব ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ যেখানে পূর্ব থেকেই ওয়াহ্‌য়ির আইন বিদ্যমান। তবে, একই রকম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ই ইসতিহ্‌সান ও ইসতিসলাহ্-এর মতোই একটি নীতি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি এ নীতির নাম দিয়েছেন ইসতিসহাব।[১৮] আক্ষরিকভাবে ইসতিসহাব-এর অর্থ হলো সংযোগ খুঁজে বের করা। কিন্তু, আইনের পরিভাষায় এ শব্দটি দ্বারা পূর্বের কোনো পরিস্থিতির সাথে নতুন পরিস্থিতির সংযোগ ঘটানোর মাধ্যমে ফিকহি আইন বের করে আনার পদ্ধতিকে বোঝায়। এ নীতিটির ভিত্তি হলো, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য আইন ততক্ষণই বহাল থাকবে, যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তির দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে তার জীবিত বা মৃত হওয়া নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে ইসতিসহাব নীতি অনুযায়ী, সে নিশ্চিতরূপে জীবিত থাকলে যেসকল নিয়মকানুন প্রযোজ্য হতো সেগুলোর সবকিছুই বলবৎ থাকবে।

---

[১৮] আল-মাদখাল, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

শাফি'ই মাযহাবের প্রধান ছাত্র

যে সকল ছাত্র আজীবন ইমাম শাফি'ই-র মাযহাব অনুসরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন, ইমাম আল-মুযানি, আর-রাবী' ও ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া প্রমুখ।

ইমাম আল-মুযানি (১৭৫–২৬২ হিজরি; ৭৯১–৮৭৬ সাল)

তাঁর পুরো নাম হলো ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মুযানি। ইমাম শাফি'ই-র মিশরে অবস্থানকালের পুরো সময় জুড়ে আল-মুযানি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তিনি শাফি'ই ফিক্‌হের উপর একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করার কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন। পরবর্তীকালে মুখতাসার আল-মুযানি শিরোনামে তিনি গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেন। তাঁর রচিত এই গ্রন্থটিই পরবর্তীকালে শাফি'ই মাযহাবের সর্বাধিক পঠিত ফিক্‌হ গ্রন্থে পরিণত হয়।

আর-রাবী' মারাদি (১৭৪–২৫৯ হিজরি; ৭৯০–৮৭৩ সাল)

আর-রাবী' মারাদি ইমাম শাফি'ই-র গ্রন্থ আল-উম্ম্‌-এর প্রধান বর্ণনাকারী হিসেবে খ্যাত। তিনি আর-রিসালাহ ও অন্যান্য গ্রন্থের পাশাপাশি ইমাম শাফি'ই-র জীবদ্দশায় উক্ত গ্রন্থটির সংকলন সম্পন্ন করেন।

ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বুয়াইতি

ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া শাফি'ই মাযহাবের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ইমাম শাফি'ই-র স্থলাভিষিক্ত হন। সে সময়ে কুর'আন আল্লাহর সৃষ্টি বা সৃষ্ট বস্তু—মু'তাযিলি এই দর্শনকে রাষ্ট্র সমর্থন প্রদান করে। কিন্তু এ ভ্রান্ত দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে এই বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞকে বন্দি অবস্থায় নির্মম নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়।[১৯]

[১৯] বোযিনা গাজানী স্ত্রেযেস্কা (Bozena Gajanee Stryzewska), তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামি, (বৈরুত, লেবানন, দার আল-আফাক্‌ আল-জাদীদাহ), প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

শাফি‘ই মাযহাবের অনুসারীবৃন্দ

শাফি‘ই মাযহাবের অনুসারীবৃন্দের বেশিরভাগই বসবাস করেন মিশর, দক্ষিণ আরব (ইয়েমেন, হাদরামাওত), শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, পূর্ব আফ্রিকা (কেনিয়া, তানজানিয়া) ও দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামে।

হানবালি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ (১৬৪–২৪১ হিজরি; ৭৭৮–৮৫৫ সাল)

এ মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবাল আশ-শায়বানির নামানুসারে। তিনি ১৬১ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস্ মুখস্থকারী ও বর্ণনাকারী। ইমাম আবু হানীফাহ্র বিখ্যাত ছাত্র আবু ইউসুফের অধীনে হাদীস্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তিনি। এছাড়াও ইমাম শাফি‘ই-র নিজ তত্ত্বাবধানে ফিক্হ ও হাদীস্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

তাঁর সমকালীন খলীফাগণ অনেক মু‘তাযিলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এ ভ্রান্ত আকীদাহ্র বিরোধিতার কারণে ইমাম আহমাদকে অনেক নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়। কুর’আনকে সৃষ্টি করা হয়েছে—ভ্রান্ত এই দার্শনিক চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে খলীফা আল-মা’মূনের (শাসনকাল ১৯৭–২২৭ হিজরি; ৮১৩–৮৪২ সাল) নির্দেশে তিনি কারারুদ্ধ হয়ে দুবছর নির্যাতিত হন। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পুনরায় বাগদাদে পাঠদান করতে থাকেন। আল-ওয়াসিক শাসনভার হাতে নেওয়ার পর (শাসনকাল ২২৭–২৩১ হিজরি; ৮৪২–৮৪৬ সাল) পুনরায় তাঁর উপর নির্যাতন আরম্ভ হয়। ফলে, ইমাম আহমাদ পাঠদান বন্ধ করে দেন এবং পরবর্তী খলীফা মুতাওয়াক্কিলের (শাসনকাল ২৩২-২৪৭ হিজরি; ৮৪৭-৮৬১ সাল) ক্ষমতা লাভের আগ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর তিনি আত্মগোপনে থাকেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল মু‘তাযিলি বিশেষজ্ঞদের বহিষ্কার করে সরকারিভাবে

তাঁদের দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাঁর উপর এ নির্মম নির্যাতনের অবসান ঘটে। ইমাম আহমাদ ২৪১ হিজরিতে (৮৫৫ সাল) ইন্তেকাল করার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বাগদাদে তাঁর পাঠদান অব্যাহত রাখেন।[২০]

হানবালি মাযহাবের গঠন

ইমাম আহমাদের মূল লক্ষ্য ছিল হাদীস সংগ্রহ, বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করা। তিনি ত্রিশ হাজারেরও বেশি হাদীসের একটি বিশাল সংকলন প্রস্তুত করেন যা মুসনাদ আহমাদ নামে পরিচিত। এ গ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করাই ছিল তাঁর প্রধান শিক্ষাপদ্ধতি। পাশাপাশি তিনি সেসব হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সহাবিগণের বিভিন্ন মতামতও পর্যালোচনা করতেন। তারপর তিনি হাদীস কিংবা সিদ্ধান্তগুলোকে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করতেন। কোনো সমস্যা সমাধানে প্রাসঙ্গিক হাদীস কিংবা সহাবিদের কোনো মত পাওয়া না গেলেই কেবল তিনি নিজের মত প্রকাশ করতেন। সেক্ষেত্রেও তিনি ছাত্রদের তাঁর ব্যক্তিগত মত লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করতেন। ফলে, তাঁর মাযহাব তাঁর নিজ ছাত্রদের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়নি; বরং সংরক্ষিত হয়েছে তাঁর ছাত্রদের ছাত্রদের মাধ্যমে।

হানবালি মাযহাবে আইনের উৎস

১. আল-কুর'আন

পূর্বসূরী ইমামদের মতোই ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবালের কাছেও মহা গ্রন্থ আল কুর'আন হলো আইনের প্রথম ও প্রশ্নাতীত উৎস। অন্য কথায়, তাঁর মাযহাবে সর্বক্ষেত্রে কুর'আনকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

[২০] আল-মাদখাল, পৃ. ২০০।

২. আস-সুন্নাহ

আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মৌলিক উৎসগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র শর্ত ছিল যে, হাদীসটি মারফু' বা স্বয়ং নাবি ﷺ থেকে বর্ণিত হতে হবে।

৩. সহাবিগণের ইজমা'

ইমাম আহমাদ সহাবিগণের মতৈক্যকে আইনের মৌলিক উৎসগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে রেখেছেন। তবে, তিনি সহাবিগণের যুগের পর ইজমা'র দাবিকে ভুল বলেছেন। কারণ, পরবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর মতে, সহাবিগণের যুগের পর কোনো বিষয়ে সত্যিকার অর্থে ইজমা' সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

৪. সহাবিদের ব্যক্তিগত মত

কোন বিষয়ে সহাবিগণের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলে ইমাম মালিকের ন্যায় ইমাম আহমাদও সেসব মতের প্রত্যেকটিকে গুরুত্ব দিতেন। তাই এ মাযহাবের মধ্যে একই সমস্যার বহুমুখী সমাধান দেওয়ার ধারা পরিলক্ষিত হয়।

৫. দ'ঈফ হাদীস (দুর্বল হাদীস)

কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে পূর্বের চারটি উৎসের কোথাও কোনো সমাধান না পাওয়া গেলে, ইমাম আহমাদ নিজস্ব কিয়াস ব্যবহারের চেয়ে একটি দুর্বল হাদীসের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতেন। তবে, তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, হাদীসটির দুর্বলতা বর্ণনাকারী ফাসিক (পাপাচারী) কিংবা কাযযাব (মিথ্যুক) হওয়ার কারণে হতে পারবে না।

৬. কিয়াস

উল্লিখিত মূলনীতিগুলোর কোনটিই সরাসরি প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে সর্বশেষ উপায় হিসেবে ইমাম আহমাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিয়াসের নীতি প্রয়োগ

করতেন। পূর্বোক্ত মূলনীতিগুলোর মধ্য থেকে এক বা একাধিক মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি কিয়াসের মাধ্যমে একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করতেন।[২১]

হানবালি মাযহাবের প্রধান ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আহমাদের প্রধান ছাত্র ছিলেন তাঁর দুই পুত্র: সালিহ (মৃত্যু ২৬৫ হিজরি; ৮৭৩ সাল) ও 'আবদুল্লাহ (মৃত্যু ২৯০ হিজরি; ৯০৩ সাল)। তাঁর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছিলেন এমন বিখ্যাত হাদীস বিশারদের অন্যতম ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর সংকলকদ্বয় ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম।[২২]

হানবালি মাযহাবের অনুসারীবৃন্দ

এ মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারীই বসবাস করে ফিলিস্তিন ও সাউদি আরবে। মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সাউদি আরবে এ মাযহাবটি বেশ প্রভাব বিস্তার করে আছে। কারণ, সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল-ওয়াহহাব হানবালি মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেছেন, ফলে এটি অঘোষিতভাবে তার আন্দোলনের মাযহাবে পরিণত হয়। 'আবদুল-'আযীয ইবন সা'উদ আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে সাউদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি হানবালি মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিণত করেন।

---

[২১] আল-মাদখাল, পৃ. ২০২-২০৩।

[২২] তারীখ আল-মাজাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

জাহিরি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম দাউদ রহিমাহুল্লাহ (২০০–২৭০ হিজরি; ৮১৫–৮৮৩ সাল)

২০০ হিজরিতে এ মাযহাবটির প্রতিষ্ঠাতা ইমাম দাউদ ইব্ন 'আলি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমদিকে তিনি ইমাম শাফি'ই-র ছাত্রদের নিকট ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। তবে পরবর্তীকালে হাদীস্ অধ্যয়নের প্রতি ঝুঁকে গিয়ে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হানবালের হাদীস্ শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করে তাঁর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। "কুর'আন একটি মুহ্দাস্ বা নতুন অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু এবং সেহেতু তা একটি সৃষ্টবস্তু"—এমন মত প্রকাশের কারণে ইমাম আহ্মাদের ক্লাস থেকে তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এরপর, কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র মাতান বা মূল পাঠের সুস্পস্ট ও আক্ষরিক অর্থভিত্তিক (জাহির) যুক্তিপদ্ধতির এক স্বতন্ত্র পন্থা তিনি অনুসরণ শুরু করেন। এ পদ্ধতির কারণে তাঁর মাযহাবের নাম দেওয়া হয় জাহিরি মাযহাব এবং তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন দাউদ আজ্-জাহিরী নামে।[২৩]

জাহিরি মাযহাবে আইনের উৎস

১. আল-কুর'আন ও আস-সুন্নাহ

অন্যান্য ইমামদের ন্যায় ইমাম দাউদও মনে করতেন যে, কুর'আন হচ্ছে ইসলামি আইনের সর্বপ্রথম উৎস এবং এর পরই রয়েছে সুন্নাহ্‌র অবস্থান। তবে, তাঁর মতে সেগুলোর কেবল আক্ষরিক ব্যাখ্যাই আইনসম্মত। অর্থাৎ, যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র বিধিবিধানগুলো এসেছে কেবল সেই বিশেষ পরিস্থিতিতেই এগুলো প্রযোজ্য হবে।

[২৩] তারীখ তাশরী' আল-ইসলামি, পৃ. ১৮১-১৮২।

২. সহাবিগণের ইজমা'

ইমাম দাউদ সহাবিগণের ইজমা'কে আইনের উৎস হিসেবে গুরুত্ব দিতেন। তবে ইজমা'কে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি ছিল, বিষয়টি মূলত নাবি ﷺ-এর প্রতি ওয়াহ্য়ি করা হয়েছিল এবং সহাবাগণও তা জানতেন, তবে কোনো কারণে হয়তো তা হাদীস আকারে বর্ণিত হয়নি। আর কেবল এ ধরনের বিষয়েই তাঁদের মতৈক্য হয়েছে।

তাই তিনি সহাবিগণের ইজমা'কে মানবীয় বুদ্ধি প্রয়োগ বা কিয়াস নির্ভর কোনো বিষয় মনে করতেন না।

৩. কিয়াস

ইমাম দাউদ কুর'আন ও সুন্নাহ্র প্রয়োগকে আক্ষরিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাই, স্বভাবতই তিনি কিয়াসসহ সব ধরনের বুদ্ধিপ্রসূত সিদ্ধান্তের বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[২৪] তবে, কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে আইন বের করার ক্ষেত্রে কিয়াসের পরিবর্তে তিনি মাফহূম বা "অনুধাবনকৃত অর্থ" নামে একটি নীতি প্রয়োগ করেছেন। অথচ তাঁর অনুসৃত এ নীতিটি ছিল কিয়াসেরই একটি ভিন্ন রূপ।[২৫]

মাযহাবটির বিলুপ্তির কারণ

মূলত যে দুটি প্রধান কারণে জাহিরি মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটেছিল তার একটি হলো, এই মাযহাবকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো বিখ্যাত কোনো বিশেষজ্ঞ ছিল না। আর অন্যটি হলো, জাহিরি মাযহাবের সীমিত পরিসর। বস্তুত, ইমাম দাউদের জীবদ্দশায়, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর দেড় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এ মাযহাব প্রসার লাভ করতে পারেনি।

---

[২৪] আল-মাদখাল, পৃ. ২০৬।

[২৫] জে.এইচ. ক্রেমার্স ও এইচ.এ.আর. গিব, শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, (কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইথাকা, নিউ ইয়র্ক), ১৯৫৩, পৃ. ২৬৬।

পরবর্তী সময়ে, যেসব বিশেষজ্ঞ ক্বিয়াসের বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের সবাইকে ঢালাওভাবে জাহিরি উপাধি দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁরা হয়তো কেউই ইমাম দাঊদ কিংবা তাঁর ছাত্রদের কারও কাছে কখনো অধ্যয়ন করেননি; এমনকি তাঁদের রচিত বই-পুস্তকও পড়েননি।

জাহিরি মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন 'আলি ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হায্ম আল-আন্দালুসি (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরি; ১০৭০ সাল) নামে এক স্পেনীয় মেধাবী বিশেষজ্ঞ। ইব্ন হায্ম এ মাযহাবকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ রচনার মাধ্যমে একে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির অন্যতম হলো: উসূল আল-ফিক্হ-এর উপরে ইহ্কাম আল-আহ্কাম, ধর্মতত্ত্বের উপর আল-ফিসাল এবং ফিক্হের উপর আল-মুহাল্লা। ইব্ন হায্মের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে এ মাযহাবটি ইসলামি স্পেনে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। স্পেনে বিকশিত হয়ে এ মাযহাবটি উত্তর আফ্রিকার কিছু অঞ্চল ও অন্যান্য এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে ইসলামি রাষ্ট্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ মাযহাব স্পেনে প্রচলিত ছিল। আন্দালুসের মুসলিম রাষ্ট্রটির বিলুপ্তির সাথে সাথে এ মাযহাবটিও চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেবল পেছনে রেখে যায় কিছু মননশীল লেখনী যেগুলোর অধিকাংশ রচনা করেছিলেন ইব্ন হায্ম নিজেই।[২৬]

জারীরি মাযহাব

প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইমাম আত-তাবারি রহিমাহুল্লাহ (২২৪–৩১০ হিজরি; ৮৩৯–৯২৩ সাল)

এ মাযহাবটি প্রতিষ্ঠা করেন ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ আত-তবারি। তিনি ২২৪ হিজরিতে ইরানের তাবারিস্তান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস, ফিক্হ ও ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন

[২৬] তারীখ আল-মাজাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭৫-৪০৯।

করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ইমাম আবু হানীফাহ, ইমাম মালিক, শাফি'ই ও অন্যান্য আইনজ্ঞদের মাযহাবগুলো অধ্যয়ন করেন। মিশর থেকে ফেরার পর প্রথম দশ বছর তিনি কঠোরভাবে শাফি'ই মাযহাব অনুসরণ করেন। তারপর তিনি তাঁর নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুসারীরা মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে নিজেদের জারীরি হিসেবে পরিচয় দিতো। কিন্তু, তাঁর মাযহাব তুলনামূলকভাবে অতি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইবন্ জারীর তাঁর রচিত জামি' আল-বায়ান নামক কুর'আনের তাফসীর গ্রন্থের জন্য সর্বাধিক খ্যাত। এটি তাফসীর আত-তবারি নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। ইতিহাসের উপর তাঁর লিখিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ হলো তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক। এই গ্রন্থটি তারীখ আত-তবারি হিসেবে পরিচিত এবং এটিও তাঁর তাফসীর গ্রন্থের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত।[২৭]

[২৭] তারীখ তাশরী' আল-ইসলামি, পৃ. ১৮২-১৮৩।

অধ্যায় সারাংশ

❶ প্রধান মাযহাবগুলো ছিল হানাফি, মালিকি, শাফি'ই, হানবালি ও যায়দি মাযহাব। এ মাযহাবগুলো প্রধানত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রথম প্রজন্মের কিছু অসাধারণ ছাত্রের কারণে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল।

❷ কম প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর মধ্যে ছিল আওযা'ই মাযহাব, লাইসি মাযহাব, সাওরি মাযহাব, জাহিরি মাযহাব ও জারীরি মাযহাব। রাজনৈতিক কারণ কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মাযহাবকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের ব্যর্থতার কারণে এ মাযহাবগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

❸ ইসলামি আইনের যে সকল উৎসের ব্যাপারে প্রধান মাযহাবগুলোর মধ্যে মতৈক্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হলো: আল-কুর'আন, আস-সুন্নাহ, সহাবিগণের ইজমা' ও কিয়াস।

❹ সুন্নাহকে ইসলামি আইনের একটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সবগুলো মাযহাবই কোনো না কোনো শর্ত জুড়ে দিয়েছে।
৪.ক. হানাফি মাযহাবের শর্ত হলো, হাদীসটি ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে হবে।
৪.খ. মালিকি মাযহাবের শর্ত হলো, হাদীসটি মাদীনাবাসীদের ইজমা'র সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।
৪.গ. শাফি'ই মাযহাব হাদীসটি সহীহ হওয়ার উপর জোর দিয়েছে।
৪.ঘ. হানবালি মাযহাবের একমাত্র শর্ত হলো, হাদীসটির বর্ণনাকারীদের ধারা নাবি ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে এবং তা জাল হতে পারবে না। ফলে, নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহ রয়েছে এমন হাদীসকেও হানবালি মাযহাবে সুন্নাহর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫ ইসলামি আইনের বিতর্কিত উৎসগুলো হলো:

৫.ক. হানাফি মাযহাবে সমর্থিত ইসতিহ্সান ও বিশেষজ্ঞদের ইজমা'।

৫.খ. মালিকি মাযহাবে অনুসৃত ইসতিস্লাহ্, মাদীনাবাসীদের ইজমা' ও তাঁদের প্রথাগুলো।

৫.গ. হানাফি ও মালিকি মাযহাবে সমর্থিত 'উর্ফ (প্রথা)।

৫.ঘ. হানবালি মাযহাবে সমর্থিত দুর্বল হাদীস্।

৫.ঙ. যায়দি মাযহাবে সমর্থিত আক্ওয়াল 'আলি অর্থাৎ চতুর্থ খলীফা 'আলির বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মতপার্থক্যের নেপথ্য কারণ

পূর্বের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, প্রধান চারটি মাযহাবের ইমামগণের সকলেই ইসলামি আইনের প্রধান চারটি মূলনীতি তথা কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াসের আইনগত গুরুত্বের ব্যাপারে একমত। তবে কিছু বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে এবং এখনো তা বিদ্যমান। এসব মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার নেপথ্যে ছিল বিভিন্ন কারণ। প্রধান কারণটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল:

১. শব্দের ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ;

২. হাদীসের বর্ণনা (প্রাপ্তির সহজতা, বিশুদ্ধতা, গ্রহণের শর্তাবলি এবং মূলপাঠের ভিন্নতার ব্যাখ্যা);

৩. কিছু নীতিমালা (ইজমা', মাদীনাবাসীদের প্রথা, ইসতিহ্সান এবং সাহাবিগণের মতামত); এবং

৪. কিয়াসের পদ্ধতি।

আমাদের এ আলোচনায় বিদ্যমান চারটি প্রধান মাযহাবের মতকে উল্লেখ করা হবে।

১. শব্দার্থ

শব্দার্থকে কেন্দ্র করে শারী'আহ্র প্রমাণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেসব মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১.ক. একাধিক আক্ষরিক অর্থ

কুর'আন ও সুন্নাহ্‌তে ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুর' শব্দটি (বহুবচন: কুরূ' বা আকরা') মহিলাদের ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়কে বুঝায়; আবার দুই ঋতুস্রাবের অন্তর্বর্তী পবিত্রতার সময়কেও বোঝায়। ফলে, কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন,

وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ...﴿٢٢٨﴾

"তলাক্‌প্রাপ্তা মহিলাদের তিন কুরূ' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে..."

(আল-বাকারাহ ২:২২৮)

তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে এমন কোনো তলাক্‌প্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতে দুটি ভিন্ন ব্যাখ্যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্যের সৃষ্টি করে। কুরূ' শব্দকে যে 'আলিমগণ পবিত্রতা অর্থে নিয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিতে তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হওয়া মাত্র তলাক্ চূড়ান্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, যেসব 'আলিমগণ কুরূ' শব্দকে ঋতুস্রাব অর্থে নিয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিতে তৃতীয় ঋতুস্রাব শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তলাক্ কার্যকর হবে না।

ক) ইমাম মালিক, শাফি'ই ও আহ্‌মাদ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কুরূ' মানে পবিত্র অবস্থা।

খ) ইমাম আবু হানীফাহ রায় দিয়েছেন যে, কুরূ' শব্দের অর্থ হলো ঋতুস্রাব।[১]

---

(১) 'আবদুল্লাহ 'আবদুল-মুহ্‌সিন আত-তুর্কি, আসবাব ইখতিলাফ আল-ফুকাহা (রিয়াদ, মাত্বা'আহ আস-সা'আদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪), পৃ. ১৯০।

১.গ. ব্যাকরণগত অর্থ

কিছু কিছু আরবি শব্দের ব্যাকরণিক গঠনের মধ্যেও কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইলা অব্যয়টির সরল অর্থ হলো "পর্যন্ত; তবে সহকারে নয়"। যেমনটি কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে:

...ثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ... ﴿١٨٧﴾

"... রাত পর্যন্ত সিয়ামকে পূর্ণ করো..." (আল-বাকারাহ, ২:১৮৭)

সিয়ামের সময় হলো মাগরিব পর্যন্ত। অর্থাৎ রাতের শুরু পর্যন্ত, তবে রাত সিয়ামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আয়াতটির এ ব্যাখ্যা নিয়ে 'আলিমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

আবার ইলা অব্যয়টি অনেক সময় "পর্যন্ত এবং সহকারে"ও বোঝায়। যেমনটি কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে,

وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

"আর আমি অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত পশুর মতো জাহান্নামের দিকে (পর্যন্ত ও এর ভিতরে) হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।" (মারইয়াম ১৯:৮৬)

কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে উদু' সম্পাদনের একটি দিক আলোচিত হয়েছে:

فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ... ﴿٦﴾

তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত (ইলা) হাত ধোবে।' (আল-মা'ইদাহ, ৫:৬)

আয়াতটির অর্থ প্রসঙ্গে ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ দুটি মত প্রদান করেছেন:

হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহু সুনানি আবি দাঊদ গ্রন্থে, বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১৯৮৯, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ১৬৫; জামি' আস-সহীহ, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৩–১৩৪।

ক) ইমাম আবু হানীফাহ্র ছাত্র যুফার, ইমাম দাউদ জাহিরি[৯] এবং ইমাম মালিকের কয়েকজন ছাত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতে ইলা অব্যয়ের অর্থ 'কনুই পর্যন্ত, তবে কনুইসহ নয়'।[১০]

খ) অন্যদিকে চার ইমামের সকলেই মত দিয়েছেন যে, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হলো 'কনুই পর্যন্ত এবং কনুইসহ'।[১১] নাবি ﷺ-এর উদু'র পদ্ধতি সম্পর্কিত বিশুদ্ধ হাদীস্গুলোও তাদের এই মতকে সমর্থন করে।[১২]

২. হাদীসের বর্ণনা

হাদীস্ বর্ণনা ও প্রয়োগের ব্যাপারে আইনজ্ঞদের মধ্যে মূলত নিম্নোক্ত কারণে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে:

২.ক. হাদীস প্রাপ্তির সহজতা

মূলত দুটি কারণে অনেক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু হাদীস্ অনেক বিশেষজ্ঞ 'আলিমের কাছেই পৌঁছেনি।

১. হাদীস্ বর্ণনাকারী সহাবিগণ ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

---

(৯) ইমাম দাউদ আজ্-জাহিরির পুত্র আবু বাক্র মুহাম্মাদ (২৫৫-২৯৭ হিজরি; ৮৬৯-৯১০ সাল)।

(১০) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলি শাওকানি, নাইল আল-আওতার, (মিশর, আল-হালাবি প্রেস, সর্বশেষ সংস্করণ), খণ্ড ১, পৃ. ১৬৮ এবং ইব্ন কুদামাহ, আল-মুগনি, কায়রো, মাকতাবাহ আল-কাহিরাহ, ১৯৬৮, খণ্ড ১, পৃ. ৯০।

(১১) আল-ইনসাফ ফী বায়ান আসবাব আল-ইখতিলাফ, পৃ. ৪২–৪৩।

(১২) নু'আইম ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-মুজমির বলেন, 'আমি আবু হুরায়রাকে উদু' করতে দেখেছি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণরূপে ধুতেন। তারপর তিনি তাঁর বাহুর উপর দিকের কিছু অংশ সহকারে ডান বাহু ধুয়ে বললেন, "আমি আল্লাহর রসূলকে এভাবেই উদু' করতে দেখেছি।"'

২. হাদীসের সংকলনগুলো প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রধান মাযহাবগুলো ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। ইমাম আবু হানীফাহ (৮০–১৫০ হিজরি; ৭০২–৭৬৭ সাল), ইমাম মালিক (৯৩–১৭৯ হিজরি; ৭১৭–৮৫৫ সাল), ইমাম শাফি'ই ও ইমাম আহমাদের (১৬১–২৪২ হিজরি; ৭৭৮–৮৫৫ সাল) মাযহাবগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশে। পক্ষান্তরে, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি ও চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমাংশের আগে হাদীসের বিশুদ্ধ ও বিশাল সংকলনগুলোর(১৩) কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক হাদীস না পাওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম দৃষ্টান্ত:

ক) ইসতিসক়া বা বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফাহ্র সিদ্ধান্ত ছিল যে, এর জন্য জামা'আত-বদ্ধভাবে সলাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। তাঁর এ মতের ভিত্তি ছিল আনাস ইব্ন মালিকের বর্ণিত একটি হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে, নাবি ﷺ কোনো এক ঘটনায় সলাত আদায় না করেই বৃষ্টির জন্য দু'আ' করেছিলেন।(১৪)

খ) তবে, তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য সকল ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, ইসতিসক়ার জন্য জামা'আতে সলাত আদায় করা সঠিক।(১৫) তাঁদের এ মতের ভিত্তি হলো 'আব্বাদ ইব্ন তামীম ও অন্যদের কাছ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। যেখানে বলা হয়েছে যে, নাবি ﷺ সলাত আদায়ের স্থানে গিয়ে কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ' করলেন, তারপর তাঁর গায়ের জামাটি উল্টে পরিধান করলেন এবং অন্যদের সাথে নিয়ে জামা'আতের সাথে দুরক'আত সলাত আদায় করলেন।(১৬)

---

(১৩) সহীহ্ বুখারি, সহীহ্ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসা'ই ও ইব্ন মাজাহ এর হাদীস গ্রন্থগুলো।

(১৪) সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৪২৩-৪২৪, হাদীস নং ১৯৫৬।

(১৫) আল মুগনি, খণ্ড ২, পৃ. ৩২০। আরও দেখুন বিদায়াহ আল-মুজতাহিদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৮২।

(১৬) সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৪২২, হাদীস নং ১৯৪৮।

২.খ হাদীসের দুর্বল বর্ণনা

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতিপয় আইনবিদ দ'ঈফ তথা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের ভিত্তিতে নিজেদের আইনগত মতামত প্রদান করেছেন। কারণ, তাঁরা হয়তো সে হাদীসটির দুর্বলতার ব্যাপারটি জানতেন না, অথবা তাঁরা মনে করতেন, দ'ঈফ হাদীসকে তাঁদের ব্যক্তিগত কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।(১৭) যেমন,

ক) ইমাম আবু হানীফাহ, তাঁর ছাত্রবৃন্দ ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবাল মত দিয়েছিলেন যে, বমি করলে উদু' ভেঙে যাবে। তাঁদের এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি হলো 'আ'ইশাহ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটিতে নাবি ﷺ বলেছেন,

> "কোনো ব্যক্তি কাই', রু'আফ অথবা কাল্স (এগুলো বমির বিভিন্ন ধরন) আক্রান্ত হলে, তার উচিত কোনো কথা না বলে সলাত ছেড়ে দিয়ে উদু' করে সলাতের বাকি অংশ আদায় করা।"(১৮)

খ) ইমাম শাফি'ই ও ইমাম মালিক মত দিয়েছেন যে, কাই' বা বমি উদু' ভঙ্গের কারণ নয়। এর সপক্ষে তাঁরা দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয় এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামি আইনের অন্যান্য উৎসগুলোর কোথাও বমিকে উদু' ভাঙার কারণ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

২.গ. হাদীস গ্রহণের শর্তাবলি

হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম শর্ত আরোপের কারণে সুন্নাহর ক্ষেত্রে আইনবিদদের মধ্যে একটি মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

---

(১৭) আল-মাদখাল, পৃ. ২১০।

(১৮) 'আ'ইশাহ বর্ণিত এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইব্ন মাজাহ। শাইখ আলবানি এ হাদীসটিকে দ'ঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দা'ঈফ আল-জামি' আস-সগীর, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১৯৭৯), খণ্ড ৫, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ৫৪৩৪।

ইমাম আবু হানীফাহ্‌র শর্ত হলো আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য হাদীসটিকে অবশ্যই মাশহূর বা সুপরিচিত হতে হবে। অন্যদিকে ইমাম মালিকের শর্ত হলো, প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য হাদীসটি মাদীনার প্রথার পরিপন্থী হতে পারবে না। ইমাম আহ্মাদ মুরসাল[১৯] হাদীসগুলোকেও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর ইমাম শাফি'ই কেবল সা'ঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যিবের মুরসাল হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোকে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ খুবই বিশুদ্ধ বলে মনে করতেন।[২০]

২.ঘ. হাদীসের পরস্পরবিরোধী মাতান-এর সমস্যা সমাধান

কিছু কিছু হাদীসের মাতান বা মূলপাঠের অর্থের মধ্যে আপাত দৃশ্যমান বিরোধ নিরসনের জন্য মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং তাঁদের ছাত্রবৃন্দ প্রধানত দুটি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

১. কতিপয় আইনবিদ তারজীহ্ পন্থা বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ একই বিষয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন হাদীস্ পর্যালোচনা করে তাঁরা কোনোটিকে কোনোটির উপর প্রাধান্য দিতেন।

২. অন্য কতিপয় আইনবিদ জামা' (সমন্বয়)-এর পন্থা অবলম্বন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা একটি হাদীসকে সাধারণ অর্থে ধরে নিয়ে বাকিগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বিশুদ্ধ হাদীসে নাবি ﷺ বিশেষ কিছু সময়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করে বলেন,

(১৯) তাবি'উন (সহাবিদের ছাত্র) থেকে বর্ণিত হাদীস্ যেখানে ঐ সহাবার নাম উল্লেখ করা হয়নি যার নিকট থেকে তাবি'উন হাদীসটি শুনেছেন।

(২০) ইব্ন তাইমিয়্যাহ, রাফ' উল-মালাম 'আন আল-আ'ইম্মাহ আল-আ'লাম, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭০), পৃ. ৩১।

"ফাজ্‌র সলাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আর 'আস্‌র সলাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সলাত নেই।"(২১)

তবে কিছু সমমানের সহীহ্‌ হাদীসে সময়ের কোনো উল্লেখ ছাড়াই সর্বাবস্থায় কিছু সলাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

"তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে তার উচিত বসার আগেই দু রক'আত সলাত আদায় করা।"(২২)

ক) ইমাম আবু হানীফাহ এক্ষেত্রে তারজীহ্‌-এর পন্থা বেছে নিয়েছেন। তিনি প্রথম হাদীস্‌কে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, নিষিদ্ধ সময়ে সব ধরনের সলাতই নিষিদ্ধ। অন্যদিকে, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ই এবং ইমাম আহমাদ হাদীস্‌ দুটির জামা' বা সমন্বয় সাধন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, প্রথম হাদীস্‌টি সাধারণ এবং তার সম্পর্ক হলো নাফ্‌ল সলাতের সাথে। অন্যদিকে দ্বিতীয় হাদীস্‌টি সুনির্দিষ্ট, যেখানে সাধারণত নিষিদ্ধ সময়েও মুসতাহাব বা বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদানকৃত সলাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।(২৩)

৩. কিছু মূলনীতির গ্রহণযোগ্যতা

ইমামগণের কেউ কেউ এমন কিছু মূলনীতি তৈরি করে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, যেগুলো সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে সেসব সিদ্ধান্ত ও মূলনীতি উভয়টিই আইনজ্ঞদের মতবিরোধের উৎসে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ আইনবিদ সহাবিগণের পরের যুগের

(২১) সহীহ্‌ বুখারি, খণ্ড ১, পৃ. ৩২২, হাদীস্‌ নং ৫৫৫; সহীহ্‌ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৩৯৫, হাদীস্‌ নং ১৮০৫ এবং সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ১, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬, হাদীস্‌ নং ১২৭১।

(২২) সহীহ্‌ বুখারি, খণ্ড ১, পৃ. ২৫৯-২৬০, হাদীস্‌ নং ৪৩৫, মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৭, হাদীস্‌ নং ১৫৪০ এবং সুনান আবি দাঊদ, খণ্ড ১, পৃ. ১২০, হাদীস্‌ নং ৪৬৭।

(২৩) 'আস্‌রের ফার্দ্‌ সলাতের পর নাবি ﷺ যুহ্‌রের ছুটে যাওয়া নাফ্‌ল সলাত আদায় করতেন যেখান থেকে দ্বিতীয় মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। সহীহ্‌ বুখারি, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৫, অধ্যায় ৩৩ এবং সহীহ্‌ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮, হাদীস্‌ নং ১৮১৫ এবং বিদায়াহ আল-মুজতাহিদ, খণ্ড ১, পৃ. ৬৬-৯১।

'আলিমদের ইজমা'কেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এর সংঘটনের সম্ভাব্যতা নিয়ে ইমাম শাফি'ই সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং ইমাম আহ্মাদ সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। একইভাবে, ইমাম মালিক মাদীনার প্রথাকে আইনের একটি উৎস মনে করতেন, কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এ নীতি গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। আবার ইমাম শাফি'ই ইমাম আবু হানীফাহ্র ইসতিহ্সান ও ইমাম মালিকের ইসতিস্লাহ্—উভয় নীতিকে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এ নীতির প্রতি কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজমা' থেকে অধিক মাত্রায় স্বাধীন হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে এই নীতিগুলোর মাধ্যমে তাঁরা খুব বেশি মাত্রায় মানবীয় বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করেছেন। আবার, ইমাম শাফি'ই মনে করতেন, আইনগত বিষয়গুলোতে সাহাবিগণের মতামতকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তবে অন্যরা মনে করতেন যে, এগুলো ছিল কেবল তাঁদের নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তাই পরবর্তী প্রজন্মের উপর তা বাধ্যতামূলক নয়।[২৪]

৪. কিয়াস-এর পদ্ধতি

আইনজ্ঞগণ কিয়াস প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসকল পন্থা অবলম্বন করেছেন সম্ভবত সেগুলোই ছিল তাঁদের মতপার্থক্যের সর্বপ্রধান উৎস। তাঁদের কেউ কেউ কিয়াস ব্যবহারের জন্য কিছু পূর্বশর্ত আরোপের মাধ্যমে এর পরিধিকে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন; পক্ষান্তরে অন্যরা ব্যাপক হারে কিয়াস নীতি প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য নীতির তুলনায় কিয়াসের নীতিটি অধিক মাত্রায় ব্যক্তিগত মতভিত্তিক হওয়ায় এ নীতি প্রয়োগের জন্য তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। আর এ কারণেই ব্যাপক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।[২৫]২৫

(২৪) আসবাব ইখতিলাফ আল-ফুকাহা পৃ. ১২৬-১৩৮ এবং রাফ' উল-মালাম 'আন আল-আ'ইম্মাহ আল-আ'লাম, পৃ. ১১-৪৯।

(২৫) আল-মাদখাল, পৃ. ২০৯-২১০।

অধ্যায় সারাংশ

১. শারী'আহ্র বিভিন্ন প্রমাণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য থেকে জন্ম নিয়েছে নানামুখী সিদ্ধান্ত। আর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ মতপার্থক্যের কারণ ছিল নিম্নরূপ:
১.ক. শব্দের অর্থ; একই শব্দের একাধিক অর্থ, আক্ষরিক ও রূপক অর্থ প্রভৃতি কারণে অর্থ নিয়ে মতপার্থক্য।
১.খ. ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের বিভিন্নতা; উদাহরণস্বরূপ, কুরূ', লাম্‌স ও ইলা এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যাসংক্রান্ত ভিন্নতা।

২. হাদীসের প্রাপ্তির সহজতা, নির্ভরযোগ্যতা, হাদীস্ গ্রহণের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাবলি ও মাতান বা বক্তব্যের বিরোধ নিরসনের পদ্ধতিগুলোর ভিন্নতার কারণে হাদীস্ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে।

৩. কতিপয় ইমাম বিশেষ কিছু নীতিমালা তৈরি করে সেগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। তবে এ নীতিগুলো সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। অন্যান্য ইমামগণ সেসব মূলনীতি ও সিদ্ধান্ত—উভয়টিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমন ইসতিহ্সান এবং মাদীনাবাসীদের প্রথা।

৪. কিয়াস নামক মূলনীতিটি সাধারণভাবে গৃহীত হলেও এর মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য ছিল। ফলে দেখা যায়, একই রকম অনেক বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

পঞ্চম পর্যায়: সুসংহতকরণ

এ পর্যায়ের বিস্তৃতি আনুমানিক ৩৪০ হিজরি (৯৫০ সাল) থেকে ৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ সাল) বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার সময় পর্যন্ত। এ সময়ই 'আব্বাসি রাজত্বের অবক্ষয়ের সূচনা হয় ও অন্তিম পতনের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে। 'আব্বাসি খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন মুনাজারাহ নামক প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক ক্রমেই বেড়ে চলছিল। এসব বিতর্কের কিছু কিছু আবার গ্রন্থাকারেও লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত তর্কপ্রিয় মানসিকতা জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে এবং মাযহাবি দলাদলি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

ইতিমধ্যে মাযহাবের সংখ্যা কমে চারটিতে নেমে আসে। প্রাধান্য বিস্তারকারী চারটি মাযহাবের কাঠামো ও কর্মধারা বেশ নিয়মতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞগণ কেবল নিজ মাযহাবের উদ্ভাবিত মৌলিক নীতিমালার (উসুল) ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে বাধ্য হয়ে পড়েন। এ সময়ে ফিক্হ সংকলন আরও সুসংহত হয় এবং মাযহাবি প্রতিযোগিতা করার জন্য এগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো।[১]

চার মাযহাব

এ পর্যায়ে মাযহাবের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চারটিতে নেমে আসে। এর মধ্যে তিনটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অপরটি ছিল তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম প্রসিদ্ধ। অন্যকথায়, আওযা'ই, সুফ্য়ান সাওরি, ইব্ন আবি লাইলা, আবু

(১) আল-মাদখাল, পৃ.১৪৭–১৫৭।

সাওর এবং আল-লাইস্ ইব্ন সা'দ এর মতো বিখ্যাত ইমামদের মাযহাবগুলো হারিয়ে গিয়ে কেবল ইমাম আবু হানীফাহ, মালিক, শাফি'ই ও আহমাদ ইব্ন হানবালের মাযহাব টিকে থাকে। সময় পরিক্রমায় এই মাযহাবগুলো এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, সাধারণ মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে ভুলেই গিয়েছিল অন্য কোনো মাযহাব আদৌ কখনো ছিল কি না।

এসব মাযহাবের প্রত্যেকটিই নিজ থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদের অনুসারীবৃন্দ নিজ নিজ মাযহাবের নামে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার প্রথা চালু করেন। উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থ শারহ আস-সুন্নাহ্‌র লেখক হুসাইন ইব্ন মাস'উদ বাগাউইকে শাফি'ই মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করে আশ-শাফি'ই নামে ডাকা হতো।

এ পর্যায়ে প্রত্যেকটি মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বিশেষজ্ঞদের সব সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে সেগুলোর নেপথ্য মূলনীতিগুলো বের করে লিপিবদ্ধ করেন। মাযহাব প্রতিষ্ঠাতাগণ আলোচনা করেননি এমন কিছু বিষয়ে তাঁরা সীমিত পরিসরে ইজতিহাদও করেছেন। তবে, দরবারি বিতর্কের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে কল্পনাপ্রসূত ফিক্‌হ চর্চার ফলে ইজতিহাদের সীমিত ক্ষেত্রটিও দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়।

পরিশেষে, মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিভিত্তিক ইজতিহাদকে বজায় রাখার স্বার্থে স্বাধীন ইজতিহাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য হয়। এ সময় মাযহাবি ইজতিহাদ নামে নতুন একটি ধারা চালু হয়। এর মূল কাজ ছিল বিশেষ কোনো মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রণীত মূলনীতি অনুযায়ী সমকালীন সমস্যা সমাধানের জন্য আইন উদ্ভাবন করা। এভাবে, এ যুগের বিশেষজ্ঞগণ মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে মাঝেমধ্যে ফুরূ' বা শাখাগত কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও উসূল বা মূলনীতির ক্ষেত্রে তৎকালীন বিশেষজ্ঞদের সাথে নিজ নিজ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মতবিরোধ হয়েছে খুবই অল্প।

মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বিশেষজ্ঞগণ ও তাঁদের ছাত্রবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রে তাদের পূর্বের মত পরিবর্তন করতেন। ফলে অনেক বিষয়ে একই মাযহাবের মধ্যেও মতের বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুটি মতই

সংরক্ষিত আকারে মাযহাবের বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্ত হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে।

মাযহাবের প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকেও মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ তারজীহ্ নীতি ব্যবহার করেছেন। এ নীতির মাধ্যমে তাঁরা কোনো একটি বিষয়ে মাযহাবের কোনো বিশেষজ্ঞের মতকে একই মাযহাবের অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সুসংহতকরণের এ যুগে প্রত্যেকটি মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি আরোপিত দুর্বল ও জাল বক্তব্যগুলোকে নিখুঁতভাবে যাচাই বাছাই করার চেস্টা করেছেন। এরপর প্রতিষ্ঠাতাদের মতামতের বর্ণনাগুলোকে তাঁরা বিশুদ্ধতা অনুযায়ী শ্রেণিভুক্তও করেন। যাচাই বাছাই ও শ্রেণিভুক্তকরণের এ প্রক্রিয়াকে তাসহীহ্ নামে অভিহিত করা হয়।

মাযহাবের ভিতর ফিক্হের এই বিস্তৃত নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ একটি মাযহাবের মধ্যেই আইনি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। পূর্ববর্তী পর্যায়ের মতো এই যুগের বিশেষজ্ঞগণও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা যদিও অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করেছেন; তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে পরবর্তীকালে মাযহাবি দলাদলি বৃদ্ধিতে এগুলো বরং আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

ফিক্হ সংকলন

'আব্বাসি শাসনামলের এ পর্যায়ে ফিক্হ গ্রন্থ রচনায় বিষয় বিন্যাসের একটি নতুন ধারা বিকশিত হয়। এ ধারাটি এমনই একটি আদর্শে পরিণত হয় যা আজও অব্যাহত আছে। বিভিন্ন বিষয়কে তাঁদের প্রধান শিরোনাম অনুসারে এবং শিরোনামগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি শারী'আহ্র একেকটি প্রধান আলোচ্য বিষয়কে উপস্থাপন করে। এমনকি পরিচ্ছেদগুলোর ক্রমধারাও একটি অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়।

সাধারণত ইসলামি আকীদাহ বিষয়ক গ্রন্থে ঈমান নিয়ে আলোচনা করা হতো। তাই ফাকীহ্গণ ঈমানের পরের চারটি স্তম্ভ দিয়ে শুরু করতেন। পরিচ্ছেদগুলোকে নিম্নোক্ত ক্রমধারা অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হতো। তহারাহ বা পবিত্রতা, সলাত, সওম, যাকাত ও হাজ্জসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা করার পর তাঁরা নিকাহ্ (বিয়ে) ও তলাক্ (বিবাহ-বিচ্ছেদ), তারপর বাই' (ব্যবসা-বাণিজ্য) ও আদাব (শিষ্টাচার) সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে আসতেন।

এ সকল বিষয়ের আলোচনায় লেখক নিজ মাযহাব ছাড়াও অন্যান্য মাযহাবের মতামতও উপস্থাপন করতেন। তারপর বিভিন্ন মাযহাবের যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করে নিজ মাযহাবের মতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে আলোচনা শেষ করতেন।

অধ্যায় সারাংশ

1. প্রথম যুগে যেসব মাযহাব বিকশিত হয়েছিল এ যুগে এসে সেগুলোর বেশিরভাগই হারিয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে কেবল চারটি মাযহাব।

2. মাযহাবগুলো সুসংহতকরণ ও নিয়মতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

3. মাযহাবের কাঠামো বহির্ভূত ইজতিহাদ পরিত্যাজ্য হয় এবং মাযহাবি ইজতিহাদ এই স্থানকে দখল করে নেয়।

4. ফিক্হ মুকারান বা তুলনামূলক ফিক্হশাস্ত্র গড়ে ওঠে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা দলীয় চিন্তাধারাকে আরও বেগবান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো।

অষ্টম অধ্যায়

ষষ্ঠ পর্যায়: বন্ধ্যাত্ব ও অবনতি

৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ সাল) বাগদাদ ধ্বংস ও সর্বশেষ 'আব্বাসি খলীফা আল-মুসতা'সিম নিহত হওয়ার পর থেকে ইংরেজি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ছয় শ বছর এ পর্যায়টি বিস্তৃত। এ যুগেই ৬৯৮ হিজরিতে (১২৯৯ সাল) তুর্কি নেতা প্রথম 'উস্‌মানের মাধ্যমে 'উস্‌মানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও পরিশেষে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আক্রমণে এর পতন ঘটার আগ পর্যন্ত তা টিকে থাকে।

তাক্‌লীদ বা মায্‌হাবের অন্ধ অনুসরণ ও দলাদলি ছিল এ যুগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই অবক্ষয়ের পরিণতিস্বরূপ সব ধরনের ইজতিহাদ পরিত্যাজ্য হয় এবং মায্‌হাবগুলো যেন সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এ যুগে ফিক্‌হ সংকলন কেবল পূর্বের গ্রন্থগুলোর ব্যাখ্যা রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সেগুলোও নিবেদিত ছিল কেবল সংকলকদের নিজ নিজ মায্‌হাবের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে। ফিক্‌হের গতিশীলতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক আইনই সেকেলে হয়ে পড়ে। পূর্বের ফাকীহ্‌গণ তাঁদের সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব আইন প্রণয়ন করেছিলেন তা পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

আইনগত এই শূন্যতাকে পূরণের জন্যই ইউরোপীয় আইনের বিভিন্ন ধারাকে মুসলিম আইন ব্যবস্থার সাথে এনে সংযোজন করা হয়। এরপর ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আবির্ভাব ও মুসলিম সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার ফলে ইউরোপীয় আইন ইসলামি আইন ব্যবস্থার স্থান দখল করে নেয়। এ বন্ধ্যাত্ব ও অবনতির ধারাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে কতিপয় মহান সংস্কারক ইসলামি জীবনব্যবস্থার আদি বিশুদ্ধতার দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ব্যাপকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ফিক্‌হ মুকারান

বা তুলনামূলক ফিক্হের পাঠদান বৃদ্ধি পেলেও মাযহাবি দলাদলি আজও অব্যাহত রয়েছে।

তাক্লীদ-এর[১] উত্থান

এ যুগের বিশেষজ্ঞগণ সব ধরনের ইজতিহাদ পরিত্যাগপূর্বক এর দরজাকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি আইন জারি করেন। তাঁরা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, ইতিমধ্যে সম্ভাব্য সকল সমস্যার আলোচনা করে তার সমাধান বের করা হয়ে গিয়েছে। অতএব, নতুন ইজতিহাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই।[২] এই পদক্ষেপের ফলে মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে একটি নতুন ধারণার জন্ম নেয়। আর তা হলো, কোনো ব্যক্তির ইসলাম চর্চা বৈধ হতে হলে তাকে অবশ্যই চারটি মাযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণ করতে হবে।

সময় পরিক্রমায় এ ধারণাটি সাধারণ মানুষ ও বিশেষজ্ঞ মহল—উভয় শ্রেণির মধ্যেই বদ্ধমূল হয়ে যায়। এর ফলে, গোটা ইসলামি জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান চারটি মাযহাবের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি মাযহাবকে ঐশীভাবে নির্দেশিত ইসলামেরই এক একটি রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে। এসব মাযহাবের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের সবগুলোকেই সম্পূর্ণ সঠিক ও সমমানের ধরে নেওয়া হয়। এমনকি এ যুগে কোনো কোনো 'আলিম নাবি ﷺ-এর কিছু হাদীসকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেন তিনি নিজেই ইমাম ও তাঁদের মাযহাবের আবির্ভাবের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ফলে প্রতিষ্ঠিত চারটি মাযহাবের বাইরে যাওয়াকে ধর্মত্যাগের সমতুল্য অপরাধ মনে করা হতো।

কেউ মাযহাব মানতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে ধর্মত্যাগী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এ পর্যায়ের অতি-সংরক্ষণশীল 'আলিমগণ আরও

---

(১) কোনো মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ।

(২) মুহাম্মাদ হুসাইন আয্-যাহাবি, আশ-শারি'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ, মিশর, দার আল-কুতুব আল-হাদীস্, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ১২।

একধাপ এগিয়ে রায় দিয়েছিলেন যে, নিজ মাযহাব পরিবর্তন করে অন্য মাযহাবে প্রবেশ করার দায়ে কোনো ব্যক্তি ধরা পড়লে স্থানীয় বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী তিনি তাকে যেকোনো ধরনের শাস্তি দিতে পারেন।

হানাফি 'আলিমগণ হানাফি মাযহাব অনুসারীদের সাথে শাফি'ই মাযহাবের অনুসারীদের বিয়েকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৩] এমনকি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতও মাযহাবি গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পায়নি। এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের ইমামের পেছনে সলাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাতে শুরু করে। একাধিক মাযহাবের অনুসারী বসবাস করে এমন এলাকার মাসজিদগুলোতে[৪] সলাতের পৃথক পৃথক মিহরাব (ইমাম দাঁড়ানোর স্থান) তৈরি করা হয়। সিরিয়ার সুন্নি মুসলিমগণ হানাফি অথবা শাফি'ই মাযহাব অনুসরণ করতেন। এখনও সেখানে একাধিক মিহরাব বিশিষ্ট এ ধরনের মাসজিদ দেখা যায়।

এমনকি মুসলিম জাতি ও ইসলামের ঐক্যের প্রতীক আল-মাসজিদ আল-হারাম-এও এর প্রভাব পড়েছিল। কা'বাহ্‌র চারপাশে প্রতিটি মাযহাবের জন্য একটি করে পৃথক মিহরাব তৈরি করা হয়। সলাতের সময় হলে এক মাযহাবের ইমাম এসে তাঁর মাযহাবের অনুসারীদের সালাতে ইমামতি করতেন। তারপর আরেকজন ইমাম এসে নিজ মাযহাবের অনুসারীদের সালাতে ইমামতি করতেন, আর এভাবেই চলতে থাকত। উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত কা'বাহর চারপাশে প্রত্যেক মাযহাবের জন্য পৃথক মিহরাবের ব্যবস্থা ছিল। এরপর ১৩৪২ হিজরিতে (১৯২৪ সালে) 'আব্দুল-আযীয ইব্‌ন সা'উদ মাক্কা জয় করে মাযহাব নির্বিশেষে সকল সালাত আদায়কারীকে একজন ইমামের পেছনে সলাত আদায় করতে একতাবদ্ধ করেন।

---

(৩) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানি, সিফাহ সলাত আন-নাবি, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, নবম সংস্করণ, ১৯৭২), পৃ. ৫১।

(৪) মাসজিদ হলো সলাতের স্থান। আরবিতে বহুবচনে একে মাসাজিদ বলা হয়।

তাক্লীদ-এর কারণগুলো

তাক্লীদ বা অন্ধ অনুসরণ অবশ্যই ইত্তিবা' তথা যুক্তিসংগত অনুসরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলার নীতিটি অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি নীতি। বস্তুত, প্রথম যুগের 'আলিমদের ব্যাখ্যাগুলোকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার ফলেই ইসলামের বাণী এখনো পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। কারণ, প্রথম দিককার সেসব ব্যাখ্যার ভিত্তি ছিল নাবি ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহ্যি এবং তাঁর জীবন পদ্ধতি। তিনি নিজেই বলেছেন যে, সর্বোত্তম প্রজন্ম তাঁর প্রজন্ম, তারপর তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম এবং তারপর তার পরের প্রজন্ম।(৫) তবে, রসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারও সিদ্ধান্ত ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই যাচাই-বাছাই ব্যতীত কারও সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। স্পষ্টত ভুল দেখা সত্ত্বেও যারা অন্ধভাবে বিশেষ কোনো মাযহাবের মতকে অনুসরণ করে তাদের কার্যকলাপকে বোঝানোর জন্য এই বইয়ে তাক্লীদ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যেসব সাধারণ মানুষ সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না তাদের দায়িত্ব হলো, তাদের যতটুকু জ্ঞান আছে সে অনুযায়ী আ'মাল করা, সত্যকে মেনে নেওয়ার জন্য নিজেদের মন উন্মুক্ত রাখা এবং যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের উপর নির্ভর করা।

মাযহাবগুলোর অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয় ও বাইরের কিছু কারণে মূলত এমন তাক্লীদ-এর সূত্রপাত হয়। এটি ফিক্হশাস্ত্রের বিকাশ ও বিশেষজ্ঞদের মানসিকতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। কোনো একক কারণকে এই অবনতির প্রধান কারণ হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব নয়; সম্ভব নয় সবগুলো কারণও খুঁজে বের করা। যে স্পষ্ট কারণগুলো ফিক্হশাস্ত্রকে বন্ধ্যাত্বের এ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে তার কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. মাযহাবগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং সব খুঁটিনাটি মাসআলাহ প্রণয়ন করা হয়ে গিয়েছিল। অনুমাননির্ভর সমস্যার সমাধানকল্পে

---

(৫) ইব্ন মাস'উদ, আবু হুরায়রা, 'ইমরান ইব্ন হুসাইন ও 'আ'ইশাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম, খন্ড ৪, পৃ. ১৩৪৬, হাদীস নং ৬১৫৩-৬১৫৪ এবং পৃ. ১৩৪৭, হাদীস নং ৬১৫৬ ও ৬১৫৯।

গড়ে ওঠা ফিক্‌হশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নয়নের ফলে, ঘটেছে এবং ঘটতে পারে—এমন সব কিছুর আইন বের করে ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ করা হয়ে গিয়েছিল। তাই মৌলিক ইজতিহাদের প্রয়োজন খুব একটা অবশিষ্ট থাকেনি। এ কারণেই মাযহাবগুলোর প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞদের মতামত ও গ্রন্থগুলোর উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করার একটি প্রবণতা গড়ে ওঠে।

২. ইসলামি আইন ব্যবস্থাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা 'আব্বাসি খিলাফাতের মূলক্ষমতা একপর্যায়ে চলে যায় মন্ত্রীদের (ওয়াযীর) কাছে। এদের অনেকেই ছিল শী'আহ মতাবলম্বী। পরিশেষে মুসলিম এ সাম্রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাষ্ট্রের শাসকদের ইসলামি আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার চেয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতার লড়াইয়ে ঝোঁক বেশি ছিল।

৩. 'আব্বাসি সাম্রাজ্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকটি নতুন রাষ্ট্র নিজের পছন্দ মতো মাযহাব অনুসরণ করতে শুরু করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিশর শাফি'ই মাযহাব, স্পেন মালিকি মাযহাব এবং তুরস্ক ও ভারত হানাফি মাযহাব অনুসরণ করতে থাকে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কেবল রাষ্ট্রীয় মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকে তাদের শাসক, কার্যনির্বাহক ও বিচারক নিয়োগ দিতো। তাই, যে সকল বিশেষজ্ঞ বিচারক হতে চাইতেন, তাঁদেরকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মাযহাব অনুসরণ করতে হতো।

৪. কিছু অযোগ্য ব্যক্তি দীনকে নিজের খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তনের অসৎ উদ্দেশ্যে ইজতিহাদ করতে শুরু করে। অন্যদিকে বেশ কিছু বিষয়ে কতিপয় অযোগ্য 'আলিমের সিদ্ধান্তে জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এসবের হাত থেকে শারী'আহকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সে যুগের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞগণ ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।[৬]

(৬) আল-মাদখাল, পৃ. ১৩৬–১৩৭।

ফিক্‌হ সংকলন

উল্লিখিত কারণগুলোর প্রভাবেই বিশেষজ্ঞগণ পূর্ববর্তীদের গ্রন্থগুলোকে পর্যালোচনা ও সম্পাদনা করার মধ্যে নিজেদের সৃজনশীল ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের ফিক্‌হ গ্রন্থগুলো ছিল এমনিতেই সংক্ষিপ্ত; সেগুলোর আরও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীকালে সেগুলোকে সহজে মুখস্থ করার সুবিধার্থে আবারও সংক্ষেপ করা হয়। এদের অনেকগুলোকে ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। একসময় এই সারাংশগুলো সমকালীন শিক্ষার্থীদের জন্য ধাঁধায় পরিণত হয়। এরপর বিশেষজ্ঞদের পরবর্তী প্রজন্ম আবার সেসব সারাংশ ও কাব্যের ব্যাখ্যা লিখতে শুরু করেন। তার পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর ভাষ্য রচনা করেছেন। কেউ কেউ আবার সেসব ভাষ্যের উপর টীকা সংযোজন করেছেন।

এ যুগে ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি তথা উসুল আল-ফিক্‌হ-এর উপর কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। এসব গ্রন্থে ইজতিহাদের সঠিক পদ্ধতি ও তা প্রয়োগের শর্তাবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। তবে, এসব গ্রন্থে যে সকল শর্ত আরোপ করা হয় তা এতটাই কঠোর ছিল যে, কেবল তাঁদের সমসাময়িক বিশেষজ্ঞগণই নয়, পূর্বেকার ইজতিহাদ চর্চাকারী অনেক বিশেষজ্ঞের মধ্যেও এসব শর্ত পূরণের যোগ্যতা ছিল না।

এ যুগে তুলনামূলক ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপরও কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। আগের যুগের গ্রন্থগুলোর মতো এসব গ্রন্থেও বিভিন্ন মাযহাবের মতামত প্রমাণসহ পর্যালোচনা করে গ্রন্থকারগণ তাঁদের নিজ মাযহাবে মতকেই সর্বাধিক বিশুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

এ যুগের শেষের দিকে 'উসমানি খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি আইনকে বিধিবদ্ধ করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাতজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্যানেলকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কাজটি ১২৯৩ হিজরিতে (১৮৭৬ সাল) সম্পন্ন হয়। তারপর সুলতানের নির্দেশে গোটা 'উসমানি সাম্রাজ্য জুড়ে তা মাজাল্লাহ আল-আহ্কাম আল-

'আদিলাহ বা ন্যায়সঙ্গত সংবিধান নামে জারি করা হয়।[৭] তবে, আপাত দৃশ্যমান এ মহৎ উদ্যোগটিও মাযহাবি গোঁড়ামি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কমিটির সব কজন বিশেষজ্ঞকেই হানাফি মাযহাব থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ফলে এ সংবিধানটিতে ফিক্হশাস্ত্রে অন্যান্য মাযহাবের অবদান সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

কলম্বাস ও ভাস্কো দা গামার অভিযানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ ও উৎসগুলোর দখল প্রক্রিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হয়। জাভা দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় এবং হিজরি ১০৯৫ (১৬৮৪ ইং) সালে ডাচদের হাতে জাভার পতন ঘটে। হিজরি ১১১০ (১৬৯৯ ইং) সালে ট্রান্সিলভ্যানিয়া ও হাঙ্গেরি 'উস্মানিদের হাত থেকে অস্ট্রিয়ার হাতে চলে যায়।

হিজরি ১১৮২–৮৮ (১৭৬৮–৭৪ ইং) সালের রুশ-তুর্কী যুদ্ধে রাশিয়ার কাছে 'উস্মানিদের পরাজয়ের ফলে অতি দ্রুত 'উস্মানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় অঞ্চলগুলো একের পর এক হাতছাড়া হয়ে যায়।[৮] এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন 'উস্মানি সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গিয়ে বিভিন্ন উপনিবেশ ও আশ্রিত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইউরোপীয় আইন-বিধানগুলো ইসলামি আইনের জায়গা দখল করে নেয়।

কয়েক দশক পূর্বে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের অবসান ঘটলেও সাউদি আরব, পাকিস্তান ও ইরান ব্যতীত সবকটি মুসলিম দেশে ইসলামি আইন পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সাউদি আরবে হানবালি মাযহাব, পাকিস্তানে মূলত হানাফি মাযহাব ও সম্প্রতি ইরানে জা'ফারি মাযহাব[৯] অনুযায়ী ইসলামি আইনকে বিধিবদ্ধ করেছে।

---

(৭) আনওয়ার আহ্মাদ কাদরি, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ইন দ্যা মডার্ন ওয়ার্ল্ড, (লাহোর, পাকিস্তান: আশরাফ, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩), পৃ. ৬৫।

(৮) ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ইন দ্যা মডার্ন ওয়ার্ল্ড, পৃ. ৮৫।

(৯) ইসনা 'আশারীয়্যাহ (দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী) শী'আহ সম্প্রদায়ের ফিক্হি মাযহাবকে ভ্রান্তভাবে ইমাম জা'ফার সাদিকের (মৃত্যু ৭৬৫ সাল) প্রতি আরোপ করা হয়েছে।

সংস্কারক

উল্লিখিত অবক্ষয় সত্ত্বেও এ যুগের বিভিন্ন সময়ে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা তাক্‌লীদ-এর বিরোধিতা করে ইজতিহাদের ধারাকে পুনরায় চালুর চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে দীনের আদি বিশুদ্ধতা ও ইসলামি আইনের সঠিক উৎসগুলোর উপর নির্ভর করার আহ্বান জানিয়েছেন। এরূপ কয়েকজন মহান সংস্কারক ও তাঁদের অবদান নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন তাইমিয়াহ

এ যুগের সংস্কারকগণের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছেন ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন তাইমিয়াহ (৬৬১–৭২৮ হিজরি; ১২৬৩–১৩২৮ সাল)। তৎকালীন প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদাহ-বিশ্বাস ও আচার-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রবলভাবে বুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক স্বার্থান্বেষী মহলের অনেকেই তাঁকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) আখ্যায়িত করে শাসকশ্রেণির মাধ্যমে বারবার কারারুদ্ধ করিয়েছে। এরপরেও ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান। প্রথম দিকে তিনি হানবালি মাযহাব অনুযায়ী ফিক্‌হ অধ্যয়ন করলেও নিজেকে এ মাযহাবের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখেননি। তিনি ইসলামি আইনের উৎসগুলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তৎকালীন ইসলামি জ্ঞানের সব কয়টি শাখায় ব্যাপক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইসলাম থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন উপদলের লেখনীগুলো এবং ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করে তিনি এগুলোর উপর বিশাল সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সময় মঙ্গোলরা সাবেক ‘আব্বাসি সাম্রাজ্যের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো দখল করে নেয় এবং মিশর ও উত্তর আফ্রিকাকে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দও ছিলেন তাঁদের সময়ের সেরা ইসলামি বিশেষজ্ঞ।

ইব্‌ন তাইমিয়াহ ইজতিহাদ ও ইসলামের বিশুদ্ধ উৎসগুলোর দিকে ফিরে আসার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর ছাত্রবৃন্দই তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে

সফলভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফিক্‌হ ও হাদীস্‌ শাস্ত্রের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ইমাম ইব্‌ন আল-কায়্যিম, হাদীস্‌শাস্ত্রের অসাধারণ বিশেষজ্ঞ ইমাম আয্‌-যাহাবি এবং তাফসীর, ইতিহাস ও হাদীস্‌শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ইমাম ইব্‌ন কাসীর।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলি আশ-শাওকানি

ইয়েমেনের শাওকান শহরে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলি আশ-শাওকানিও (১১৭৩–১২৫০ হিজরি; ১৭৫৭–১৮৩৫ সাল) এ যুগের সংস্কারকদের অন্যতম। ইমাম আশ-শাওকানি যাইদি মায্‌হাব[১০] অনুযায়ী ফিক্‌হ অধ্যয়ন করে এ মায্‌হাবের একজন অসাধারণ বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। তারপর তিনি হাদীস্‌শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর সময়ের সর্বাধিক খ্যাতিমান হাদীস্‌ বিশারদে পরিণত হন। এ পর্যায়ে তিনি নিজেকে নির্দিষ্ট মায্‌হাব থেকে মুক্ত করে নিয়ে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের চর্চা শুরু করেন। তিনি ফিক্‌হ ও *উসূল আল*-ফিক্‌হ-এর উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে সকল মায্‌হাবের মতকে পর্যালোচনা করে বিশুদ্ধতম প্রমাণ ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য যুক্তির ভিত্তিতে সমাধান দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আশ-শাওকানির মতে, তাক্‌লীদ বা অন্ধ অনুসরণ হারাম। তিনি এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন, যেমন আল-কাওল আল-মুফীদ ফী হুক্‌মি আত-তাক্‌লীদ। এই কারণে তিনিও সমকালীন অনেক তাক্‌লীদপন্থী লোকদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন।[১১]

আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দুর-রহীম

আরেকজন উল্লেখযোগ্য সংস্কারক ছিলেন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দুর-রহীম । তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহ্‌লাউই (১১১৪-১১৭৬ হিজরি; ১৭০৩-১৭৬২ সাল) নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম ভারতীয়

---

(১০) পরবর্তীকালের ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রধান শী'আহ মায্‌হাবগুলোর অন্যতম।

(১১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলি আশ-শাওকানি, নাইল আল-আওতার, খণ্ড ১, পৃ. ৩–৬।

উপমহাদেশে; আর সেখানেই তাক্বলীদ-এর চর্চা ছিল সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের পর তিনি ইজতিহাদের দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত করে মাযহাবগুলোকে একীভূত হওয়ার আহ্বান জানান।

ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিগুলো পুনঃনিরীক্ষণ ও বিভিন্ন মাযহাবের সিদ্ধান্তগুলোর প্রমাণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ হাদীস্ গবেষণায় নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করেন। তিনি প্রচলিত মাযহাবগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে মাযহাবের সিদ্ধান্তের বিপরীত কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া গেলে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নিজ মাযহাবের পরিপন্থী মত গ্রহণের স্বাধীনতা আছে।(১২)

অন্যান্য

জামাল আদ-দীন আফগানি (১২৫৪–১৩১৫ হিজরি; ১৮৩৯–১৮৯৭ সাল) সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ভারত, মাক্কা ও ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করে পরিশেষে মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি মুক্ত চিন্তার আহবান জানান এবং তাক্বলীদ ও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। মূলত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়(১৩) থেকে তিনি এই ধ্যান-ধারণা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের অনেককে প্রভাবিতও করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে জামাল আদ-দীনের কিছু কিছু চিন্তাধারা ছিল চরমপন্থী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি মানব মন ও তার যৌক্তিক উৎসারণকে ওয়াহ্য়ির সমপর্যায়ে মনে করতেন। মধ্যপ্রাচ্যে জেগে ওঠা ম্যাসনবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাঁর উদ্দেশ্য অনেকটা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে।(১৪)

---

(১২) এ জে আরবেরি, রিলিজিয়ন ইন দ্যা মিডল ইস্ট, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৯–পুনঃমুদ্রণ ১৯৮১, খণ্ড ২, পৃ. ১২৮-১২৯।

(১৩) মুসলিম বিশ্বের প্রাচীনতম ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ৩৬১ হিজরি/৯৭২ সালে ফাতিমি শী'আহ রাষ্ট্র কর্তৃক মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(১৪) মুহাম্মাদ হুসাইন, আল-ইত্তিজাহাত আল-ওয়াতানিয়্যাহ ফী আল-আদাব আল-'আরাবি আল-মু'আসির, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৩ এবং রিলিজন ইন দ্যা মিডল ইস্ট, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭।

মুহাম্মাদ 'আব্দুহু (১২৬৫-১৩২৩ হিজরি; ১৮৪৯-১৯০৫ সাল) ছিলেন আফগানির সর্বাধিক খ্যাতিমান ছাত্র। আফগানি ও ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে মুহাম্মাদ আব্দুহ ইজতিহাদের ঝাণ্ডাকে পুনরায় উত্তোলন করেন। তিনি তাক্লীদ ও তার সমর্থকদের বিরোধিতা করেন। তবে, আধুনিকতার প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ার কারণে পরবর্তীকালে কিছু ব্যাখ্যা ও আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, তাঁর রচিত তাফসীরে নবীদের প্রতি আরোপিত সকল অলৌকিক ঘটনাকে তিনি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে সংঘটিত আল্লাহ ﷻ-র কর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, কা'বাহ আক্রমণের সময় আবরাহার হস্তীবাহিনীর উপর পাখির যে-ঝাঁকটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল সেগুলো ছিল নিছক বায়ুবাহিত জীবাণু এবং তাদের মধ্যে এই জীবাণু রোগব্যাধি ছড়িয়ে দিয়েছিল। একইভাবে, মুসলিমদের সুদি কারবারে জড়িত হওয়ার অনুমতি দিয়ে তিনি একটি ফাতওয়া প্রদান করেছিলেন। "অতীব প্রয়োজনীয়তায় নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হয়ে যায়"—শারী'আহ্র এই মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি ফাতওয়াটি প্রদান করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তটি ছিল একটি মারাত্মক ভুল। কারণ, ফিক্হ শাস্ত্রের এই মূলনীতিতে 'অতীব প্রয়োজনীয়তা' বলতে মূলত জীবন-মৃত্যু কিংবা অঙ্গাহানী এ ধরনের বিষয়কে বোঝায়। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তিতে এরূপ মারাত্মক আশঙ্কাজনক কোনো বিষয় নেই।

মুহাম্মাদ আব্দুহুর প্রধান ছাত্র মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা (মৃত্যু ১৩৫৪ হিজরি; ১৯৩৫ সাল) তাক্লীদ-এর উপর নিজ শিক্ষকের আক্রমণকে অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষকের অধিকাংশ বাড়াবাড়িকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

তবে মুহাম্মাদ 'আব্দুহুর অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ চরম আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সত্য থেকে নিজেদের শিক্ষকের চেয়েও বেশি বিচ্যুত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর ছাত্র কাসিম আমীনই (মৃত্যু ১৩২৬ হিজরি; ১৯০৮ সাল) ছিল প্রথম ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলিম দাবি করা সত্ত্বেও বহু বিবাহ, ইসলামে তলাকের সহজ ব্যবস্থা ও পর্দা ইত্যাদি বিধানের উপর চরম আঘাত হানে।

ইখওয়ান আল-মুসলিমূন-এর প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-বান্না (মৃত্যু ১৩৬৮ হিজরি; ১৯৪৯ সাল), সায়্যিদ কুত্ব, জামা'আত ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা আবুল-আ'লা মাওদুদি (১৩২১-১৩৯৯ হিজরি; ১৯০৩-১৯৭৯ সাল) এবং অতি সম্প্রতি আমাদের যুগের বিখ্যাত হাদীস্ বিশারদ নাসির আদ-দীন আল-আলবানি প্রমুখ 'আলিমদের মতো বিংশ শতাব্দীর আরও অনেক 'আলিমগণই ইসলামি পুনর্জাগরণের পতাকা উত্তোলন করে মাযহাবগুলোকে পুনরায় একীভূত করার আহ্বান জানিয়েছেন।[১৫]

তথাপিও বর্তমান যুগে বেশিরভাগ 'আলিমই নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ইচ্ছাকৃত কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলেও তাদের এই কর্মপন্থার কারণে মুসলিম জাতির মধ্যকার বিভাজন একরকম স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। নিকট ভবিষ্যতে এই অবস্থার উন্নতির খুব একটা আশা দেখা যায় না। কারণ, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সক্রিয়ভাবে কোনো না কোনো মাযহাবের প্রচারণা চালাচ্ছে।

এ কথা সত্য যে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে ফিক্হ মুকারান বা তুলনামূলক ফিক্হশাস্ত্রকে এখন একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে হাদীসের অধ্যয়নও আগের তুলনায় আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে বাস্তবতা হলো, ইসলামি শিক্ষার মাযহাবি দৃষ্টিভঙ্গি হাদীস্ ও ফিক্হশাস্ত্রের গতিশীলতাকে অনেকটা সীমিত করে দিয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় মাযহাব অনুসরণ করছে; আর এর ফলে ইসলামি আইনের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ফিক্হের সবগুলো মৌলিক কোর্সই রাষ্ট্রীয় মাযহাব অনুযায়ী শেখানো হচ্ছে।[১৬] মূলত রাষ্ট্রীয় মাযহাব অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতে সক্ষম 'আলিম গড়ে তোলার জন্যই এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

---

(১৫) আল-বান্না'র অন্যতম অনুসারী আস-সাইয়্যিদ সাবিকের লেখা ফিক্হ আস-সুন্নাহ গ্রন্থটি এ আহ্বানে সাড়া দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

(১৬) বর্তমান সময়ে এ নিয়মের হাতেগোনা কয়েকটি ব্যতিক্রমের একটি হলো সাউদি আরবের মাদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। এর ৮০ শতাংশেরও বেশি ছাত্র এসেছে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে এবং সেখানে কলেজ স্তরে ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মাযহাবকে অন্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। এটিই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে সবকটি প্রধান মাযহাবের মতকে শেখানো হয়। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় নিজ মাযহাব উল্লেখ করতে হয় এবং প্রতিটি মাযহাবের ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে স্থান দেওয়া হয়। অধ্যয়নের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের তাদের নিজ মাযহাবের অধ্যাপকগণই পাঠদান করেন। এর ফলে অন্যান্য মাযহাবের মতামত কেবল দায়সারা ভাবেই পড়ানো হয়। সত্য জানার উদ্দেশ্যে নয় বরং নিজেদের মাযহাবের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই হাদীসের পাঠদান করা হয়। অধ্যয়ন চলাকালে নিজ মাযহাবের পরিপন্থী কোনো মত এসে পড়লে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ তা একান্ত ভাসাভাসাভাবে আলোচনা করেন। এরপর তিনি নিজ মাযহাবের মতের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দিয়ে অন্য মাযহাবের মতটিকে খণ্ডন করেন।

এভাবে, অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হলেও এসব শিক্ষক অন্যদের সেসব মতের প্রতি কোনো সম্মানও প্রদর্শন করেন না। একইভাবে, হাদীস্ অধ্যয়নকালে কোনো শক্তিশালী হাদীস্‌কে নিজ মাযহাবের মতের পরিপন্থী মনে হলে শিক্ষক তাঁর মাযহাবকে সমর্থন দেওয়ার জন্য হয় হাদীস্‌টিকে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করেন নতুবা এড়িয়ে যান।

দুটির একটিও করা সম্ভব না হলে শিক্ষক নিজ মাযহাবের সমর্থনে অনেকগুলো দুর্বল হাদীস্ বর্ণনা করেন, অথচ এগুলোর দুর্বলতার কথা একটুও উল্লেখ করেন না। তখন মনে হয় যেন ঐ মাযহাবের মতটির সমর্থনে অধিক সংখ্যক হাদীস্ রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরাও নিজেদের মাযহাবের মতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নবপ্রত্যয় লাভ করে।

অধ্যায় সারাংশ

১. এ যুগে সকল ধরনের ইজতিহাদ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং চার মাযহাবের যেকোনো একটির অন্ধ অনুসরণকে সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়।

২. চারটি মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী এক ধরনের মানসিকতা জেঁকে বসে এবং মুসলিম উম্মাহ বলতে গেলে চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৩. ‘আলিমদের লেখনী কেবল পূর্বেকার গ্রন্থগুলোর ব্যাখ্যা রচনা এবং লেখকের মাযহাব প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৪. ফিক্হশাস্ত্রের আদি বিশুদ্ধতা ও গতিশীলতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কতিপয় সংস্কারকের প্রচেষ্টা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে, মাযহাবি গোঁড়ামির শেকড় এত গভীরে প্রবেশ করেছিল ছিল যে, এর মূলোৎপাটনে তাঁদের আপ্রাণ প্রচেষ্টাও খুব বেশি সফলতা লাভ করেনি।

৫. ইসলামি আইনের আলোকে একটি সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল, তবে তাও ছিল মাযহাবি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। এরপর ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আবির্ভাবের ফলে সেগুলো ইউরোপীয় আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়।

৬ সংস্কারমূলক বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাযহাবি গোঁড়ামি কিছুটা কমে এসেছে এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তুলনামূলক ফিক্বহশাস্ত্রের শিক্ষা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে।

৭ ফিক্বহশাস্ত্রের বন্ধ্যাত্ব ও অবনতি এবং মাযহাবি দলাদলি আজও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

নবম অধ্যায়

ইমাম ও তাক্লীদ

পূর্বের পরিচ্ছেদগুলোতে ফিক্হশাস্ত্রের সাথে মাযহাবের আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরার মাধ্যমে এদের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গোটা ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও শার'ই বিধানগুলো অনুধাবনের ক্ষেত্রে মাযহাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদানও তুলে ধরা হয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে, ওয়াহ্য়ির অনুধাবন ও বাস্তবায়নের জন্য ফিক্হশাস্ত্র ও মাযহাব উভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর বান্দা এবং মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও দায়দায়িত্বের মূলনীতিগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, কুর'আন ও সুন্নাহ্র যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর হিকমাত যুগে যুগে মানুষের কাছে প্রকাশিত হতে পারে। আল্লাহপ্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে 'আলিমগণ বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে সমস্যার প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে মাযহাব ও ফিক্হশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর এখানেই ফিক্হশাস্ত্র ও মাযহাবের সঠিক তাৎপর্য নিহিত।

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া এক সার্বজনীন ও শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব হলো নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য শারী'আহ্র আলোকে ফিক্হের মূলনীতি ও সুনির্দিষ্ট ফিক্হি বিধান প্রণয়ন করা। 'আলিমদের যেকোনো ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা তাঁদের যোগ্যতা ও তাঁদের কাছে বিদ্যমান প্রমাণের ধরন ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 'আলিমদের কেউ কেউ সাংস্কৃতিক বৈপরিত্যের কারণে কিছু বাড়তি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের থেকে দূরে অবস্থান করতেন। আর তাই অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে

পারস্পরিক পরামর্শের সুবিধা থেকে তাঁরা অনেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে অঞ্চলভেদে মতের বিভিন্ন রকম পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রথম যুগের বিশেষজ্ঞগণ আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ও সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানের কারণে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এর ফলে একটি পর্যায়ে মাযহাবের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। উল্লিখিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক মাযহাবের আবির্ভাব ছিল একটি অনিবার্য বিষয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাসহ অন্যান্য আরও অনেক কারণে 'আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্যও ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে, অন্যদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টত কুর'আন ও সুন্নাহ্র বাঞ্ছিত অর্থের নিকটতর মনে হলে বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের মত পরিত্যাগ করে তা মেনে নিতে মোটেও কুণ্ঠিত হতেন না। যতদিন তারা সত্যের অনুসরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, সংকীর্ণ দলীয় চিন্তা, গোঁড়ামি, ব্যক্তিগত সুখ্যাতি ও পুরস্কারের লোভে বিপথে যাননি; ততদিন পর্যন্ত ইসলামের মৌলিক চেতনা তাঁদের মাযহাবগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত ছিল। 'আলিমদের মধ্যে গর্হিত এসব সংকীর্ণতা জেঁকে বসার আগ পর্যন্ত সত্যানুসন্ধানের একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে অব্যাহত ছিল।

কালক্রমে ইজতিহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও কোনো একটি মাযহাবের অন্ধ অনুসরণের প্রথার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংকীর্ণ চিন্তার একটি প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। মাযহাবকেন্দ্রিক চিন্তার কারণে অনেক 'আলিমের মধ্যে সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি অনীহার সৃষ্টি হয়। এরপর, বিদ্যমান চারটি মাযহাবের মধ্যে অসংখ্য মতপার্থক্য সত্ত্বেও এগুলোর প্রত্যেকটিকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে বিবেচনা করা হতো। মাযহাবের অনুসরণ করার জন্য বেশ কিছু জাল হাদীসের আবির্ভাব ঘটানো হয়। পক্ষান্তরে, যুগে যুগে বেশ কিছু সংস্কার আন্দোলন মাযহাবগুলোকে পুনরায় একত্রিত করার আহ্বান জানায়; আবার কেউ কেউ সকল মাযহাব বর্জন করার আহ্বান জানায়। প্রথম আহ্বানটি বৈধ, যেহেতু মাযহাবগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং মুসলিম জাতির সংহতির জন্য এদের একত্রীকরণ অপরিহার্য। অন্যদিকে,

দ্বিতীয়টি একটি চরমপন্থী আহ্বান; সম্ভবত বিদ'আতিও বটে। কারণ, এটি মহান আল্লাহর আইনের অনুধাবন ও মূল্যায়নের জন্য কুর'আন ও সুন্নাহ্র সম্পূরক হিসেবে একটি একতাবন্ধ মাযহাবের গুরুত্বকে উপেক্ষা করছে।

ফিক্হশাস্ত্র ও মাযহাবগুলোর ক্রমবিকাশের এক পর্যায়ে বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যকার মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে দলাদলি চরম আকার ধারণ করে। এক সময়ে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তৎকালীন বিশেষজ্ঞগণ ইজতিহাদ পরিত্যাগ করে চারটি মাযহাবের যেকোনো একটির অনুসরণকে সাধারণ মুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেন। অথচ এসব মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ নিজেরাই এমন মতপার্থক্য অপছন্দ করতেন এবং কখনোই তাঁরা অন্ধ অনুসরণকে সমর্থন করতেন না।

তবুও, অনেক মানুষ আজও অন্ধভাবে মাযহাবের অনুসরণ করে। এমনকি মাযহাবের মতের বিপরীত হলে অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীস্ পরিত্যাগ করাকেও বৈধ মনে করে। কারণ, ঐ হাদীস্টিকে মেনে নেওয়া মানেই হলো একথা স্বীকার করে নেওয়া যে, তার মাযহাবের ইমাম সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। আর তাদের মতে এরূপ চিন্তাধারা ধর্মদ্রোহতুল্য বেয়াদবি। অথচ তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করে না যে, নাবি ﷺ-এর বক্তব্যের উপর তাদের ইমামের মতকে প্রাধান্য দেওয়া স্বয়ং তাদের ইমামদের অবস্থানেরই সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়[১]। এর নাম শির্ক ফী তাওহীদ আল-ইত্তিবা', অর্থাৎ, প্রশ্নাতীত আনুগত্যে নাবি ﷺ-এর সাথে কাউকে শরিক করা। কারণ, কোনও ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় নাবি ﷺ কে প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণীয় একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে মেনে নেয়, কেননা তাঁর অনুসরণই আল্লাহর 'ইবাদাত।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিমই প্রথম যুগের মহান ইমামদের চিন্তা-চেতনা ও তাঁদের মাযহাবের বর্তমান অবস্থার মধ্যকার অসংগতির ব্যাপারে অসচেতন। তাই তাক্লীদ-এর ব্যাপারে প্রথম যুগের ইমাম ও তাঁদের ছাত্রবৃন্দের বক্তব্যগুলোর প্রতি আরেকটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা সমীচীন।

(১) আল্লাহর প্রাপ্য 'ইবাদাতের ভাগ অন্য কাউকে দেওয়া, যেমন: মূর্তিপূজা।

ইমাম আবু হানীফাহ নু'মান ইব্ন সাবিত রহিমাহুল্লাহ (৮০–১৫০ হিজরি; ৭০২–৭৬৭ সাল)

ইমাম আবু হানীফাহ তাঁর ছাত্রদেরকে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতগুলো লিপিবদ্ধ করতে নিরুৎসাহিত করতেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলোর ভিত্তি ছিল কিয়াস। তবে, তাঁর ছাত্রদের সকলে মিলে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে যেসব ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হয়েছিলেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি এমনটি করেননি। তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন যে, একদিন ইমাম তাঁকে বললেন, "তোমার ধ্বংস হোক, ইয়া'কূব। আমার কাছ থেকে যা কিছু শুনো তার সবকিছু লিখে ফেলো না। কারণ, আজ আমি যে মত পোষণ করব, আগামীকাল হয়তো তা পরিত্যাগ করব। এর পরের দিন আরেকটি মত পোষণ করে তার পরের দিন হয়তো সেটিও পরিত্যাগ করব।"[২]

ইমাম আবু হানীফাহ্র এ মনোভাব ছাত্রদেরকে তাঁর মতের অন্ধ অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছে এবং নিজেদের পাশাপাশি অপরের মতামতকেও শ্রদ্ধা করার মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

ইমাম আবু হানীফাহ তাঁর নিজের ও তাঁর ছাত্রদের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কোন মূলনীতি বা প্রমাণের আলোকে তিনি ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ মত দিয়েছেন তা না জেনে তিনি সে মতের অন্ধ অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ইমাম যুফার বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফাহ বলেছেন, "যে আমার প্রমাণ সম্পর্কে জানে না, সে আমার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবে না। কারণ আমরা সবাই-ই মানুষ; আজ আমি যে কথা বলব আগামীকাল হয়তো তা পরিত্যাগ করব।"[৩]

---

(২) ইব্ন মাঈন তার গ্রন্থে 'আব্বাস ও দুরীর এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আত তারীখ, মাক্কা, কিং 'আবদুল-আযীয ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৯, খণ্ড ৬, পৃ. ৮৮।

(৩) ইব্ন 'আব্দিল-বার্‌র, আল ইন্তিকা ফী ফাদা'ইল আস্-সালাসাহ আল-আ'ইম্মাহ আল-ফুকাহা, কায়রো, মাকতাবুল কুদসী, ১৯৩১, পৃ. ১৪৫।

আবু হানীফাহ তাঁর সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সব সময়ই সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর ছাত্রবৃন্দ ও অন্যদের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন যে, সঠিক ও ভুলের চূড়ান্ত মানদণ্ড হলো কুর'আন ও সুন্নাহ। যা কিছু এর সাথে সংগতিপূর্ণ তা-ই সঠিক, আর যা কিছু সংগতিপূর্ণ নয় তা-ই ভুল। তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, "আমি যদি আল্লাহর কিতাব কিংবা তাঁর রসূলের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকি, তাহলে আমার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান কোরো।"(৪)

মহান এ ইমাম থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতে চায় তবে সেই ব্যক্তির উচিত সহীহ হাদীসকে মেনে নেওয়া। ইমাম ইব্ন 'আব্দিল-বার্র বর্ণনা করেছেন যে আবু হানীফাহ বলেছেন, "কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে, সেটিই আমার মাযহাব।"(৫)

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস রহিমাহুল্লাহ (৯৩–১৭৯ হিজরি; ৭১৭–৮০১ সাল)

ইমাম মালিকের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে, তিনি জনসম্মুখে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেও কখনো দ্বিধা করতেন না। তাঁর একজন প্রধান ছাত্র ইব্ন ওয়াহাব ইমামের এই উদার মনোভাব তুলে ধরে বলেছেন, "আমি একদিন এক ব্যক্তিকে ইমাম মালিককে উদূর সময় পায়ের আঙুলের মাঝখানে ধোয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম। জবাবে তিনি বললেন, 'ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।' উপস্থিত লোকদের চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। অধিকাংশ লোক চলে গেলে তাঁকে জানালাম যে, এ ব্যাপারে একটি হাদীস আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সেটি?' তখন আমি বললাম যে, আল-লাইস ইব্ন সা'দ, ইব্ন লুহায়'আহ ও 'আম্র ইব্ন আল-হারীস—এঁরা সবাই মুস্তাওরিদ ইব্ন শিদাদ আল-কুরাশি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল

(৪) আল-ফুলানি, ঈকাজ আল-হিমাম, কায়রো, আল-মুনীরিয়্যাহ, ১৯৩৫, পৃ. ৫০।
(৫) ইব্ন 'আবিদীন, আল হাশিয়াহ, কায়রো, আল-মুনীরিয়্যাহ, ১৮৩৩–১৯০০, খণ্ড ১, পৃ. ৬৩।

ﷺ-কে তাঁর হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে নিজ পায়ের আঙুলের মাঝখানে ঘষতে দেখেছেন। ইমাম মালিক একথা শুনে বললেন, "নিঃসন্দেহে এটি একটি উত্তম হাদীস্। ইতিপূর্বে আমি কখনো হাদিসটি শুনিনি।" পরবর্তীকালে, আমি যখন লোকদের এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, তখন ইমাম মালিক জোর দিয়ে বলতেন যে, অবশ্যই তা ধুতে হবে।"(৬)

বর্ণনাটি থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানীফাহ্‌র মাযহাবের মতো ইমাম মালিকের মাযহাবও ছিল বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে গঠিত। যদিও এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফাহ্‌র মতো তাঁর থেকে প্রাপ্ত কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আমাদের জানা নেই।

ইমাম মালিক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি ভুলের উর্ধ্বে নন এবং তাঁর সেসব মতই কেবল গ্রহণ করা উচিত যেগুলো কুর'আন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ইব্‌ন 'আব্‌দিল-বার্‌র্ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মালিক বলেন, "আমি একজন মানুষ, আমি ভুল করতে পারি। আবার কখনও সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারি। সুতরাং আমার মতামতগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে দেখবে। যা কিছু কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র সাথে সংগতিপূর্ণ তা গ্রহণ করবে, আর যা কিছু সাংঘর্ষিক তা প্রত্যাখ্যান করবে।"(৭)

এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, ইমাম মালিকও অন্য সবকিছুর উপর কুর'আন ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি কখনো চাননি যে, তাঁর মতামত অন্ধভাবে অনুসরণ করা হোক। 'আব্বাসি খলীফা আবু জা'ফার আল-মানসুর ও হারূন আর-রাশীদ ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা' নামক হাদীস্ সংকলনকে গোটা ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধানে পরিণত করার জন্য তাঁর অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেছিলেন, সাহাবিগণ ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং তাঁদের থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস্ই তাঁর এ সংকলনে নেই।

---

(৬) ইব্‌ন আবি হাতিম, আল-জারহ্ ওয়াত-তা'দীল, হায়দ্রাবাদ, ভারত: মাজলিস দা'ইরাহ আল-মা'আরিফ আল-''উস্‌মানিয়্যাহ, ১৯৫২, মুখবন্ধ, পৃ. ৩১–৩৩।

(৭) ইব্‌ন 'আব্‌দিল-বার্‌র্, জামি' বায়ান আল-'ইল্‌ম, কায়রো, আল মুনীরিয়্যাহ, ১৯২৭, খণ্ড ২, পৃ. ৩২।

এভাবে, ইমাম মালিক নিজ মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় মাযহাবে পরিণত করার সুযোগ পেয়েও তা নাকচ করে দেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা নিঃসন্দেহে সকলের জন্য অনুকরণীয়।

ইমাম আশ-শাফি'ই রহিমাহুল্লাহ (১৫০–২০৪ হিজরি; ৭৬৭–৮২০ সাল)

ইমাম আশ-শাফি'ই তাঁর শিক্ষক ইমাম মালিকের মতোই স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, তাঁর সময়[৮] নাবি ﷺ থেকে বর্ণিত সকল হাদীস্ সম্পর্কে জানা বা প্রাপ্ত সব হাদীস্ মুখস্থ রাখা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তৎকালীন 'আলিমগণের কারও কারও কাছে কিছু হাদীস্ না পৌঁছার কারণে কিছু বিষয়ে তাঁরা ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। তাই ভুল-শুদ্ধ নিরূপণে সর্বাবস্থায় নির্ভরযোগ্য একমাত্র মানদণ্ড হলো নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ। হাদীস্ বিশেষজ্ঞ ইমাম হাকিম ইমাম শাফি'ই-র একটি বক্তব্য সংকলন করেছেন; যেখানে তিনি বলেছেন, "আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর সব সুন্নাহ জানেন বা কোনো কিছুই ভুলে যাননি। কাজেই, আমি যে-মূলনীতি বা যে-আইনই প্রণয়ন করি না কেন, তাতে আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ্র খেলাফ কিছু থাকাটাই স্বাভাবিক। অতএব, আল্লাহর রসূল যে বিধান দিয়েছেন তাই একমাত্র সঠিক বিধান এবং সেটাই আমার প্রকৃত মাযহাব।"[৯]

ইমাম শাফি'ই ব্যক্তিগত মতের উপর সুন্নাহ্র গুরুত্বের বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার যুগের মুসলিমদের মধ্যে ইজমা' ছিল যে, কারও কাছে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ চলে এলে, অন্য কারও মতকে প্রাধান্য দিয়ে তা পরিত্যাগ করা তার জন্য মোটেই বৈধ নয়।"[১০]

---

(৮) বুখারি ও মুসলিমের মতো হাদীসের প্রধান সংকলনগুলো ও অন্যান্য হাদীস্ গ্রন্থগুলো হিজরি তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়।

(৯) ইব্ন 'আসাকির, তারীখ দিমিশ্ক আল কাবীর, (দামাস্কাস, রাওদাহ আশ-শাম, ১৯১১–১৯৩২), খণ্ড ১৫, প্রথম অংশ, পৃ. ৩।

(১০) ইব্ন কায়্যিম, ই'লাম আল-মূকি'ঈন, বৈরুত, দার আল-জীল, খণ্ড ২, পৃ. ৩৬১।

নিঃসন্দেহে ইমাম শাফি'ইর এ বক্তব্য তাকলীদ-এর মূলে আঘাত করে। তাকলীদ-এর কারণে অনেক ক্ষেত্রে মাযহাবের মতকে সুন্নাহ্‌র উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; এমনকি মাযহাবের মতকে সমর্থন করতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাবি ﷺ-এর সুন্নাহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

ইমাম আল-হাকিম ইমাম শাফি'ই থেকেও ইমাম আবু হানীফাহ্‌র অনুরূপ বক্তব্য সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, "কোনো সহীহ্ হাদীস্ পাওয়া গেলে, তা-ই আমার মাযহাব।"(১১)

তাকলীদ-এর বিপক্ষে এ মহান ইমামের অবস্থান ছিল একেবারেই আপসহীন। তিনি বাগদাদে অবস্থানকালে নিজ মাযহাবের সারাংশ হিসেবে আল-হুজ্জাহ নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এরপর মিশর ভ্রমণ করে ইমাম আল-লাইস্ ইব্‌ন সা'দের মাযহাব অধ্যয়ন করার পর তিনি অনেক বিষয়ে তাঁর পূর্বের মত পরিবর্তন করেন। এরপর তিনি আল-উম্ম্ নামে একখানা নতুন গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম আহমাদ ইবন হানবাল রহিমাহুল্লাহ (১৬১–২৪১ হিজরি; ৭৭৮–৮৫৫ সাল)

ইমাম আহমাদ তাঁর ছাত্রদের অন্তরে ইসলামের মূল উৎসগুলোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। কারও ব্যক্তিগত মতের অন্ধ অনুসরণের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার মাধ্যমে ইমাম আহমাদ তাঁর শিক্ষক ইমাম শাফি'ই ও অন্যান্য ইমামদের অনুসৃত রীতি অব্যাহত রেখেছিলেন। আগের ইমামদের কিছু কিছু অনুসারীর মধ্যে তাকলীদ-এর প্রবণতা দেখা দেওয়ায় ইমাম আহমাদ আরও বেশি কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ইমাম আবু হানীফাহ তাঁর ছাত্রদেরকে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত লিপিবদ্ধ করতে শুধু নিরুৎসাহিত করেছিলেন। ইমাম আহমাদ আরও একধাপ এগিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত লিপিবদ্ধ করার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

(১১) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শারাফ আদ-দীন আন-নাওয়াউই, আল-মাজমূ', কায়রো, ইদারাহ আত্-তাবা'আহ আল-মুনীরিয়্যাহ, ১৯২৫, খণ্ড ১, পৃ. ৬৩।

তাই তাঁর ছাত্রদের যুগের পূর্বে তাঁর মাযহাব লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়নি।

ইমাম আহ্মাদ প্রকাশ্যে তাক্লীদ-এর বিরোধিতা করার মাধ্যমে অন্যদের এ ব্যাপারে সতর্ক করতেন। ইব্ন আল-কায়্যিম এ ব্যাপারে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি সংকলন করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, "মালিক, আশ-শাফি'ই, আল-আওযা'ই, আস্-সাওরি কিংবা আমার কোনো মত অন্ধভাবে অনুসরণ করবে না। তাঁরা যেখান থেকে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তোমরাও সেখান থেকে তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।"(১২)

একইভাবে, ইব্ন 'আব্দিল-বার্র্ তাঁর আরেকটি বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, "ইমাম আল-আওযা'ই, মালিক ও আবু হানীফাহ্র সিদ্ধান্তগুলো কেবল তাঁদের মতামত হিসেবেই বিবেচ্য। আমার কাছে তাদের সকলের মর্যাদা সমান। এক্ষেত্রে সঠিক ও ভুল নিরূপণের প্রকৃত মানদণ্ড হলো আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ।"(১৩)

ইমাম আহ্মাদ হাদীস্‌কে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি কিয়াসের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর একটি দুর্বল হাদীস্‌কেও প্রাধান্য দিতেন। তিনি আল-মুসনাদ আল-কাবীর শিরোনামে ত্রিশ হাজারেরও অধিক হাদীস্ সম্বলিত একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ্র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এত বেশি ছিল যে, কেউ নাবি ﷺ-এর একটি হাদীস্‌কেও অবজ্ঞা করার দুঃসাহস দেখালে তিনি তাঁকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিতেন। ইব্ন আল-জাওযি বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহ্মাদ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর একটি বিশুদ্ধ হাদীস্ প্রত্যাখ্যান করে, সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে।"(১৪)

নাবি ﷺ তাঁর উম্মাহ্র প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে,

---

(১২) ঈক্বাজ্ আল-হিমাম, পৃ. ১১৩।

(১৩) জামি' বায়ান আল-'ইল্‌ম, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৯।

(১৪) ইব্ন আল-জাওযি, আল-মানাকিব, বৈরুত, দার আল-আফাক্ আল-জাদীদাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ. ১৮২।

''আমার কাছ থেকে তোমরা যা শুনেছ তা পৌঁছে দাও, এমনকি তা যদি একটি আয়াতও হয়।''(১৫)

মূলত কিয়ামাত পর্যন্ত গোটা মানবজাতির কাছে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিল এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য। এ কারণে, ইমাম আহ্মাদ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সকলের কাছে হিদায়াহ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রত্যেকটি বিষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন।

মহান ইমামদের ছাত্রবৃন্দ

মহান ইমামগণ তাঁদের ছাত্রদেরকে অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা কোনো বিষয়ে নতুন কোনো হাদীস্ জানতে পারলে নিজ শিক্ষকের মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধা করতেন না। কারণ ইমামগণ তাঁদের এমনটি করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানীফার সাথে তাঁরই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ তাঁদের মাযহাবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।(১৬) একইভাবে আল-মুযানি ও অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ অনেক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষক ইমাম শাফি'ই-র সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

মন্তব্য

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো প্রধান চার ইমাম ও তাঁদের ছাত্রবৃন্দের অসংখ্য বক্তব্যের কিয়দংশ মাত্র। তাঁরা সুন্নাহ্র পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ দাবি করেছেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত মতের অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য একেবারেই স্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত। এগুলোর অপব্যাখ্যা করার কোনো

---

(১৫) 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আম্র ইব্ন আল-'আস্ থেকে বর্ণিত এ হাদীস্টি সংকলন করেছেন বুখারি, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪২, হাদীস্ নং ৬৬৭।

(১৬) আল-হাশিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৬২।

অবকাশ নেই। অতএব, প্রত্যেকেরই উচিত সুন্নাহকে যথাযথভাবে অনুসরণের চেষ্টা করা।

সুন্নাহ অনুসরণ করতে গিয়ে তাকে কিছু ক্ষেত্রে নিজ মাযহাবের ইমামের মতের বিপরীতেও যেতে হতে পারে। তবে এর দ্বারা তিনি নিজ মাযহাব ও ইমামের বিরুদ্ধে গিয়েছেন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এর মাধ্যমে "আল্লাহর রজ্জুকে" দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তিনি যুগপৎ সবকটি মাযহাবের অনুসরণ করছেন। বিপরীত দিকে, কেবল ইমামদের মতের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য হাদীসকে পরিত্যাগ করা হলে তা হবে স্বয়ং ইমামদের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিকন্তু, নির্ভরযোগ্য হাদীস প্রত্যাখ্যান সরাসরি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর[১৭]। এ ব্যাপারে কুর'আনে রসূল ﷺ-কে উদ্দেশ করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"না, তোমার রবের কসম! তারা কখনো (আল্লাহর একত্বে) বিশ্বাসী হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে তারা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে; তারপর তুমি যা সিদ্ধান্ত দেবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।"

(আন-নিসা', ৪:৬৫)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আল-হাসান ইমাম মালিকের গ্রন্থ আল-মুয়াত্তা' পাঠ করার পর প্রায় বিশটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষক ইমাম আবু হানীফাহর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, 'ইমাম আবু হানীফাহ মনে করতেন যে, ইসতিস্কার[১৮] জন্য কোনো নির্দিষ্ট সলাত নেই। কিন্তু আমার মতে, ইমামের উচিত জনসাধারণকে

(১৭) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানি, সিফাহ সলাত আন-নাবি, মুখবন্ধ পৃ. ৩৪–৩৫।
(১৮) খরার সময় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা।

নিয়ে ইসতিস্কার জন্য দু রক'আত সলাত আদায় করে দু'আ'[১৯] করা এবং নিজ পোষাকটি উল্টে পরিধান করা।'[২০]

আরেকটি উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার পিতা জীবিত নেই কিন্তু দাদা আছেন; তাহলে এই পৌত্রের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে দাদার উত্তরাধিকারের আইনটি। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ উভয়ই তাঁদের শিক্ষক ইমাম আবু হানীফাহ্র সাথে দ্বিমত পোষণ করে বাকি তিন ইমামের মতো একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাঁদের মতে, পিতা জীবিত থাকলে যে অংশটুকু তার জন্য বরাদ্দ হতো সেটুকু অর্থাৎ উত্তরধিকারের এক-ষষ্ঠাংশ এক্ষেত্রে দাদা পাবেন।

ইমাম ইব্ন ইউসুফ আল-বালাখি ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসানের ছাত্র এবং আবু ইউসুফের ঘনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই আবু হানীফাহ ও তাঁর এই দুই ছাত্রের সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্নতর মত দিয়েছেন। কারণ, কিছু বিষয়ের প্রমাণ তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে ইব্ন ইউসুফ আল-বালাখি সেগুলো জানতে পেরেছিলেন।[২১] দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি রুকু'র পূর্বে ও পরে দুহাত কাঁধ বরাবর তুলতেন[২২]। কিছু সহাবির কাছ থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস্ থেকে তিনি এই বিষয়ে প্রমাণ পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর মাযহাবের প্রধান তিন ইমামের কাছে উক্ত প্রমাণটি না পৌঁছায় তাঁরা ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন।

নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ প্রত্যাখ্যানকারীকে সতর্ক করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

...فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

(১৯) অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা।

(২০) মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান, আত-তা'লীক আল-মুমাজ্জিদ 'আলা মুয়াত্তা' মুহাম্মাদ, পৃ. ১৫৮, সিফাহ সলাত আন-নাবি, পৃ. ৩৮।

(২১) ইব্ন 'আবিদীন, রাস্ম আল-মুফতি, খণ্ড ১, পৃ. ২৭,সিফাহ সলাত আন-নাবি, পৃ. ৩৭।

(২২) আল-ফাওয়া'ইদ আল-বাহিয়্যাহ ফী তারাজিম আল-হানাফিয়াহ, পৃ. ১১৬, সিফাহ সলাত আন-নাবি, মুখবন্ধ, পৃ. ৩৮।

"রসূলের হুকুমের বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভয় করা উচিত যেন তারা কোনো বিপর্যয়ের শিকার না হয় অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব না এসে পড়ে।"

(আন-নূর, ২৪:৬৩)

উল্লেখ্য যে, তাকলীদ নিষিদ্ধ মানে এই নয় যে, প্রত্যেককেই প্রতিটি কাজ করার পূর্বে মূল প্রমাণ ঘেটে দেখতে হবে। এর অর্থ এও নয় যে, প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের অবদানকে প্রত্যাখ্যান কিংবা উপেক্ষা করতে হবে। কারণ, তা সম্পূর্ণ বাস্তবতা পরিপন্থী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তবে ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে তাদের উচিত মাযহাব নির্বিশেষে সকল বিশেষজ্ঞের মতামতের দিকে দৃষ্টিপাত করা। জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে একজন 'আলিমকে অবশ্যই উদার মানসিকতার অধিকারী হতে হবে; নতুবা তাঁর সিদ্ধান্তগুলো পক্ষপাতদুষ্ট ও দলঘেঁষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আইনের মূলনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও তিনি পূর্বসূরি বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের মহান কীর্তিগুলোর উপর নির্ভর করতে বাধ্য। ফিকহশাস্ত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করা একেবারেই অসম্ভব। এবং এই অপচেষ্টা করাও অনুচিত। কারণ তা নির্ঘাত বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে। কোনো বিশেষ বিষয়ে সত্যপন্থী বিশেষজ্ঞগণ হয় আগের কোনো বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করবেন, নতুবা তাঁদের প্রণীত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আগের ইমামদেরই অনুসরণ করবেন। তবে, এ ধরনের অনুসরণকে স্বয়ং ইমামদের দ্বারা নিষিদ্ধ তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ আখ্যা দেওয়া যায় না। এ পদ্ধতিকে বলা হয় ইত্তিবা'। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো সকল মতামতের উপর প্রাধান্য লাভ করবে, যেমনটি ইমাম আবু হানীফাহ ও শাফি'ই বলেছেন, "কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে, তা-ই আমার মাযহাব।"

এটি সুস্পষ্ট যে, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ মুসলিমের পক্ষেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে আইনের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা রাখা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হলো, সামর্থ্য অনুযায়ী ইত্তিবা'র নীতি অনুসরণ করা। কুর'আন-সুন্নাহ অধ্যয়ন ও 'আলিমদের দেওয়া কোনো

সিদ্ধান্তের প্রমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তার প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আরও বিস্তারিত জেনে নেওয়া। সত্যিকার জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে যথাযথ বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করা হলে কোনো সত্যপন্থী বিশেষজ্ঞই এধরনের প্রশ্নে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। বই থেকে সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়োজন হলে, সাধারণ মুসলিম ভাইদের উচিত ব্যাখ্যা ও প্রমাণসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত নয় এমন বই বাছাই করা।

সর্বাবস্থায় কেবল একটি মাযহাবের গ্রন্থগুলোর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। এভাবে তারা অন্ধ অনুসরণের নিন্দিত ধারা এড়িয়ে চলতে পারেন। যে মাযহাবেই পাওয়া যাক না কেন নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ অনুসরণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকলে, তারা মহান ইমামদের তাকলীদ নয়; বরং যথার্থ ইত্তিবা'ই করছেন।

অধ্যায় সারাংশ

১. কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ হলো মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের অবস্থান ও শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী; যদিও এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিমই অসচেতন।

২. মহান ইমামগণ ও তাঁদের ছাত্রবৃন্দের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা ছিলেন অন্ধ অনুসরণের সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং তাঁরা সব সময় আইনগত সিদ্ধান্তের ভিত্তি তথা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৩. ইমাম ও তাঁদের ছাত্রবৃন্দ বারবার স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।

৪. ইমামগণ তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতের উপর সহীহ্ হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য হাদীস মাযহাব প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের কাছে পৌঁছায়নি কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের ছাত্রবৃন্দ তা জানতে পেরেছেন। আর এগুলোর ভিত্তিতে তাঁরা ইমামদের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

৫. কোনো মাযহাবের মতামতকে সহীহ্ হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া এক ধরনের শির্ক। কারণ এটি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর মনোনীত রসূলের প্রাপ্য আনুগত্যের পরিপন্থী।

৬. যে অবস্থায় ইসলাম নাবি ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁর সহাবিদের কাছে পৌঁছেছে সেই আদি বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে

সকল মুসলিমের উচিত ইত্তিবা' করা। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে পূর্বসূরি বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তগুলো অনুসরণ করা।

দশম অধ্যায়

উম্মাহ্‌র মধ্যে মতপার্থক্য

পূর্বের পরিচ্ছেদগুলোতে মাযহাবগুলোর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রের সমৃদ্ধিকরণে মাযহাবগুলোর সামগ্রিক অবদান এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের মিলন ঘটানোর প্রয়াসে ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রের বিশেষত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে, নাবি ﷺ-এর সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের মহান ইমামগণ ও তাঁদের মাযহাবগুলোর মধ্যে যে-উদার নৈতিক মনোভাব ছিল, ধীরে ধীরে একসময় সেখানে কঠোরতা ও গোঁড়ামি জেঁকে বসে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উম্মাহর মধ্যে দলাদলির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় মাযহাবগুলো। ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রও এর ইজতিহাদ নীতির মধ্যে নিহিত আসল প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এ কারণেই ফিক্‌হ্‌শাস্ত্র সমাজের পরিবর্তনশীল ধারার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি। মাযহাবি দলাদলি ও ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রের কঠোরতার ফলে ইসলামের ঐতিহ্যগত বিশুদ্ধতা, ঐক্য ও গতিশীলতা একরকম স্থবির হয়ে পড়ে।

সর্বশেষ এই অধ্যায়ে প্রথম যুগের বিশেষজ্ঞ ও তাঁদের ছাত্রদের মতামতের আলোকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো পর্যালোচনা করা হবে। এ বিষয়টিও পুনঃপ্রমাণের প্রয়াস চালানো হবে যে, মতপার্থক্য অনিবার্য হলেও আল্লাহ ﷻ মনোনীত দীন, ইসলামে অকারণ যুক্তিবুদ্ধিহীন মতপার্থক্য ও দলাদলির কোনো স্থান নেই।

মাযহাবগুলোর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ এবং ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রের উন্নয়নের এই পর্যালোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, মহান ইমাম ও মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণের মতে,

(ক) একক কিংবা সামষ্টিকভাবে কোনো মাযহাবই ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়

(খ) কোনো একক মাযহাবের অনুসরণ মুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক নয়।

তবে তাকলীদ-এর সর্বব্যাপী প্রভাব—অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি—মুসলিম মানসিকতায় আমূল এক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর প্রভাবে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সাধারণ মুসলিমদের ভিতর বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, চারটি মাযহাবই সকল ক্ষেত্রে ঐশী নির্দেশনায় পরিচালিত এবং যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত। এসব মাযহাবের প্রত্যেকটি আইনগত সিদ্ধান্তই সঠিক ও নির্ভুল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় চারটি মাযহাবের যেকোনো একটি মেনে চলতে হবে। কোনো মুসলিম নিজের মাযহাব পরিবর্তন করতে পারবে না এবং নিজ মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের কোনো আইনগত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করবে পারবে না। এসব ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি চার মাযহাবের সবকটিকে নির্ভুল মনে না-করে কিংবা এগুলোর কোনো একটি অনুসরণের বাধ্যবাধকতাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে, তবে সে একজন অভিশপ্ত বিদ'আতি ও ধর্মত্যাগী।

বিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের ধর্মত্যাগীকে বিশেষায়িত করতে সর্বাধিক অপব্যবহৃত পরিভাষাটি হলো ওয়াহাবি (উচ্চারণ: ওয়াহ্হাবি)। প্রধানত ভারত ও পাকিস্তানে এই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আরেকটি পরিভাষা হলো আহলে হাদীস। বস্তুত এই দুটি পরিভাষাই মূলত শব্দের ভুল প্রয়োগ। নিম্নের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯২৪–২৫ সালে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওয়াহ্হাবের (১৭০৩–১৭৮৭ সাল) অনুসারীরা পবিত্র মাক্কা ও মাদীনার কবরস্থানে সাহাবিগণ ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কবরের উপর নির্মিত সকল সৌধ ধ্বংস করে ফেলেন। তৎকালীন সাধারণ মুসলিম, এমনকি অনেক 'আলিমদের মধ্যেও তাওয়াস্সুল বা মৃত ব্যক্তির নিকট সুপারিশ কামনার প্রথা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কথিত ওয়াহাবিগণ ইসলাম পরিপন্থী এই তাওয়াসসুল প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে বহু দিন ধরে তাওয়াসসুল, কবর ও মাজারে দু'আ' চাওয়ার কুপ্রথা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। তাই ১৯২৪–২৫ সালে ওয়াহাবিদের সংস্কারমূলক কার্যাবলি অনেকের কাছেই বিদ'আতি ও চরমপন্থী মনে হয়েছিল। আর এ কারণেই তখন থেকে "অভিশপ্ত বিদ'আতি" ও "ধর্মত্যাগী" ব্যক্তিকে বোঝাতে ওয়াহাবি

শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাব হানবালি মাযহাবের ফিক্‌হ অনুসরণ করতেন। এবং তাঁর বর্তমান অনুসারীরাও তা-ই করে যাচ্ছেন।

তাওয়াস্‌সুল-এর বিরোধিতা এবং মাজার ও সৌধ ধ্বংস করার মাধ্যমে ইব্‌ন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাবের বংশধর ও অনুসারীরা মূলত ইসলামবিরোধী প্রথাগুলোর উপরই আঘাত হেনেছিলেন। 'আলি ইব্‌ন আবি তালিব ﷺ বর্ণিত সহীহ্‌ মুসলিমে সংকলিত একটি হাদীসে নাবি ﷺ সকল প্রতিমা ও মূর্তি ধ্বংস এবং সকল উঁচু কবরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[১] উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, "অভিশপ্ত বিদ'আতি" ও "ধর্মত্যাগী" বোঝাতে ব্যবহৃত ওয়াহাবি শব্দটি মূলত একটি নিকৃষ্ট অপব্যবহার।

একইভাবে আহলে হাদিস (আরবি: আহ্‌লুল-হাদীস্‌) পরিভাষাটি ছিল একটি সম্মানজনক ও প্রশংসাসূচক পদবি। হাদীসের অধ্যয়নে ইমাম মালিকের মতো যারা প্রচুর সময় ও শ্রম দিতেন, অতীতে তাদের এই খেতাব দেওয়া হতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারত ও পাকিস্তানে একটি সংস্কার আন্দোলন এই নামটি গ্রহণ করে। তারা মূলত ফিক্‌হশাস্ত্রের ভিত্তি হিসেবে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং মাযহাবের অন্ধ অনুসরণের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে, সকল মাযহাব প্রত্যাখ্যানকারী ও মাযহাব অনুসরণের গোঁড়া বিরোধীদের উপর আহলে হাদিস পরিভাষাটি প্রয়োগ করে মাযহাবপন্থীরা এই পরিভাষাটির অর্থ বিকৃত করে দেয়।

ফিক্‌হশাস্ত্রের উপর আমাদের এই পর্যালোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে মূল ধারার ওয়াহাবি ও আহলে হাদিসগণ ইসলামের শিক্ষা থেকে মোটেও বিচ্যুত নন। বরং যারা ভুল হোক শুদ্ধ হোক সর্বাবস্থায় চারটি মাযহাবের

---

(১) সহীহ্‌ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৯, হাদীস্‌ নং ২১১৫। সুনান আবি দাঊদ, , খণ্ড ২, পৃ. ৯১৪-৯১৫, হাদীস্‌ নং ৩২১২। হাদীস্‌টি বর্ণনা করেছেন আবু আল-হায়্যাজ আসাদি। তিনি বলেছেন যে 'আলি ইব্‌ন আবি তালিব তাঁকে বলেছেন, "আল্লাহর রসূল আমাকে যে মিশনে পাঠিয়েছিলেন আমি কি তোমাকে সেই মিশন দিয়ে পাঠাব না? তা হলো ঘরের সকল মূর্তি কিংবা ছবির চেহারা বিকৃত করে দেওয়া এবং সমস্ত উঁচু কবরকে সমান করে দেওয়া।"

যেকোনো একটির অনুসরণ অন্যের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয় এবং প্রত্যেকটি মাযহাবের সকল সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে দাবি করে—তারাই আসলে সঠিক পথ থেকে সরে গেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অন্ধ অনুসরণ বা তাকলীদ-এর সমর্থকগণ সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, চারটি মাযহাবই সকল ক্ষেত্রে ভুলের ঊর্ধ্বে। এমনকি, 'আলিমদের মধ্যেও অনেকে এমন ধারণা পোষণ করেন।[২]

চারটি মাযহাবের প্রত্যেকটা সকল ক্ষেত্রেই ভুলের ঊর্ধ্বে—এই বিশ্বাস নিয়ে তাকলীদ-এর সমর্থকরা কেমন করে এদের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলোর মীমাংসা করবেন? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন যে, মাযহাবগুলো ওয়াহ্য়ি দ্বারা নির্দেশিত এবং নাবি ﷺ নিজে এগুলোর আবির্ভাবের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। প্রায়ই তাঁদের দাবি প্রমাণ করতে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উপস্থাপন করেন:

(ক) اِخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"আমার উম্মাহর মতবিরোধ রহমতস্বরূপ।"

(খ) أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সহাবিদের মধ্যকার মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ।"[৩]

---

(২) Taqleed Restricted to the Four Madhā-hib শিরোনামে *Taqleed and Ijtihād* গ্রন্থের লেখক লিখেছেন: "তাকলীদ-এর বাধ্যবাধকতার আলোচনা থেকে জানা গেল যে, ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব থেকে বিভিন্ন রায় গ্রহণ করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। অতএব, এমন একটি মাযহাবের তাকলীদ করা জরুরি যা মূলনীতি (উসূল) ও বিস্তারিত বিধানের (ফুরূ') ব্যাপারে এতটা সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়েছে যে তাতে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। ফলে বাইরের কোনো উৎসের দিকে যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। আল্লাহ ﷻ-র কুদরতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার এই বৈশিষ্ট্য কেবল চারটি মাযহাবের মধ্যেই বিদ্যমান। "অতএব, চার মাযাহিব-এর যে কোনো একটি মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক।" মাওলানা মুহাম্মাদ মাসীহুল্লাহ খান শেরওয়ানি, *Taqleed and Ijtihād*, (পোর্ট এলিজাবেথ, সাউথ আফ্রিকা, দ্যা মাজলিস, ১৯৮০), প্রকাশক: মাজলিসুল 'উলামা অব সাউথ আফ্রিকা, পৃ. ১৩।

(৩) জাবিরের বর্ণনায় আল-বাইহাকি কর্তৃক সংগৃহীত বলে কথিত আছে।

(গ) "আমার সহাবিরা নক্ষত্রতুল্য। তাঁদের যেকোনো একজনের অনুসরণ করলে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে।"(৪)

(ঘ) "নিশ্চয়ই আমার সহাবিরা নক্ষত্রের সদৃশ, তাঁদের যে কারও মতামত গ্রহণ করলে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে।"(৫)

(ঙ) "আমার মৃত্যুর পর আমার সহাবিগণ যে সকল বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হবে সেসব বিষয়ে আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং আল্লাহ ﷻ আমাকে জানালেন: 'হে মুহাম্মাদ, নিঃসন্দেহে তোমার সহাবিগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রের সদৃশ, একজন আরেকজনের তুলনায় হয়তো অধিকতর উজ্জ্বল। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে তাঁদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের যেকোনো একটির অনুসরণ করবে, সে মূলত হিদায়াতেরই অনুসরণ করবে।'"(৬)

এসব হাদীস্‌কে দলাদলির বৈধতার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের পূর্বে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ এসব হাদীস্ পর্যালোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মন্তব্যগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সুনির্দিষ্টভাবে ইমামগণ ও তাঁদের মাযহাবগুলোর আগমনের ব্যাপারে নাবি ﷺ-এর যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তার কোনোটিই সহীহ্ নয়। ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত হাদীস্‌গুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আম বা সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; কোনো ইমাম কিংবা

---

(৪) হাদীস্‌টির কথিত বর্ণনাকারী ইবন্ 'উমার। এটি ইবন্ বাত্তাহ তাঁর আল-ইবানাহ গ্রন্থে, ইবন্ 'আসাকির ও নিজাম আল-মুলক তাঁর আল-আমালি গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। শাইখ আলবানি এটিকে দ'ঈফ সাব্যস্ত করেছেন; সিলসিলাহ আল-আহাদীসি আদ- দ'ঈফাহ ওয়াল-মাওদু'আহ, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭২), খণ্ড ১, পৃ. ৮২ ।

(৫) হাদীস্‌টির কথিত বর্ণনাকারী ইবন্ 'আব্বাস। আল-খাতীব আল-বাগদাদি, আল-কিফায়াহ ফী 'ইল্‌ম আর-রিওয়াইয়াহ, কায়রো, দার আল-কুতুব আল-হাদীসাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২।

(৬) হাদীস্‌টির কথিত বর্ণনাকারী ইবন্ 'উমার। এটি ইবন্ বাত্তাহ তাঁর আল-ইবানাহ গ্রন্থে, ইবন্ 'আসাকির ও নিজাম আল-মুল্‌ক তাঁর আল-আমালি গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। শাইখ আলবানি এটিকে দ'ঈফ সাব্যস্ত করেছেন; সিলসিলাহ আল-আহাদীসি আদ- দ'ঈফাহ ওয়াল-মাওদু'আহ, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭২), খণ্ড ১,পৃ. ৮০-৮১।

তাঁদের কোনো মাযহাবের নাম সুনির্দিষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। যেসব হাদীসে বিশেষভাবে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয় সেগুলোর সবকটিই জাল।(৭)

উল্লিখিত প্রথম হাদীসটির ক্ষেত্রে নাবি ﷺ পর্যন্ত পৌঁছার মতো কোনো বর্ণনাকারীদের ধারা নেই। কোনো হাদীসগ্রন্থেও তা পাওয়া যায় না।(৮) এমনকি বানোয়াট হওয়ার কারণে এটিকে হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করাও অনুচিত। (খ) থেকে (ঙ) পর্যন্ত বর্ণনাগুলো হাদীসগ্রন্থ বা হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোতে পাওয়া গেলেও এগুলোর সবই অনির্ভরযোগ্য। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ প্রথমটিকে ওয়াহিন (অত্যন্ত দুর্বল),(৯) দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিকে মাওদু' (বানোয়াট)(১০) এবং চতুর্থটিকে বাতিল (মিথ্যা)(১১) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, নির্ভরযোগ্যতার দৃষ্টিতে হাদীসের মাধ্যমে মাযহাবগুলোর মধ্যকার মতপার্থক্যগুলোকে সমর্থন ও চিরস্থায়ী রূপ দান করার কোনো অবকাশ নেই।

---

(৭) উদাহরণস্বরূপ, আল-খাতীব আল-বাগদাদি একটি হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন যেটার কথিত বর্ণনাকারী আবু হুরায়রাহ। নাবি ﷺ-এর প্রতি আরোপিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে তিনি বলেছেন, "আমার উম্মাহ্র মধ্যে এক ব্যক্তির নাম হবে আবু হানীফাহ; সে হবে আমার উম্মাহ্র প্রদীপ।" আল-খাতীব নিজেই এবং আল-হাকীম নিশাপুরি এটাকে মাওদু' (জাল) আখ্যায়িত করে মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ আল-মারওয়াজির বানোয়াট বক্তব্যের মধ্যে শামিল করেছেন। (মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলি আশ-শাওকানি, আল-ফাওয়া'ইদ আল-মাজমু'আহ, বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭২, পৃ. ৩২০, হাদীস নং ১২২৬)। আল-খাতীব আরেকটি হাদীস সংগ্রহ করেছেন, যার কথিত বর্ণনাকারী আনাস। নাবি ﷺ -এর উদ্ধৃতিতে হাদীসটিতে বলা হয়েছে, "আমার পর নু'মান ইব্ন সাবিত নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যার ডাক নাম হবে আবু হানীফাহ। সে আল্লাহর দীন ও আমার সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করবে।" এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে দুজন পরিচিত হাদীস জালকারী আহমাদ জুয়াইবারি ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আস-সালামির নাম রয়েছে যাদের বর্ণনাগুলোকে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ অগ্রহণযোগ্য (মাতরূক) শ্রেণিভুক্ত করেছেন। ('আলি ইব্ন 'ইরাক, তানযীহ আশ-শারী'আহ আল-মারফূ'আহ, বৈরুত, দার আল-কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯), খণ্ড ২, পৃ. ৩০, হাদীস নং ১০।

(৮) বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ আস-সুবকি থেকে আল-মানাউই কর্তৃক বর্ণিত।

(৯) শাইখ আলবানির সিলসিলাহ আল-আহাদীসি আদ- দ'ঈফাহ ওয়াল-মাওদু'আহ, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭২), খণ্ড ১, পৃ. ৮০।

(১০) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯ এবং পৃ. ৮২-৮৩।

(১১) প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

এসব কথিত হাদীসগুলো কেবল অশুদ্ধই নয়, বরং এগুলোর অর্থ কুর'আনের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। কুর'আনের সর্বত্র আল্লাহ ﷻ দীনের ক্ষেত্রে মতবিরোধকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে ঐক্য বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে মতবিরোধকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

...وَلَا تَنَٰزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ... ﴿٤٦﴾

"আর নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে।" (আল-আনফাল, ৮:৪৬)

... وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

"এবং এমন মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেয়ো না, যারা নিজেদের দীন খণ্ড-বিখণ্ড করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দলের কাছে যা আছে তা নিয়েই তারা মেতে আছে।" (আর-রূম, ৩০:৩১–৩২)

পরোক্ষভাবেও আল্লাহ ﷻ মতবিরোধকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ...﴿١١٩﴾

'অবশ্যই তোমার প্রভু চাইলে সমগ্র মানবজাতিকে একই উম্মাহতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং একমাত্র তারাই বাঁচবে যাদের ওপর তোমার প্রভু অনুগ্রহ করেন।" (হূদ, ১১:১১৮–১১৯)

উল্লিখিত আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর দয়া মানুষের মধ্যকার বিতর্কের অবসান ঘটায়। তাহলে কীভাবে মতবিরোধ আল্লাহর দয়া হিসেবে গণ্য হতে পারে? নিম্নোক্ত আয়াতের মতো আরও অনেক আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ ﷻ একতা ও মতৈক্যের নির্দেশ দিয়েছেন,

وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا ... ﴿١٠٣﴾

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ ﷻ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো।"

(আলি 'ইমরান, ৩:১০৩)

সাহাবিদের মধ্যে মতপার্থক্য

কুর'আনের এসব সুস্পষ্ট নিন্দাবাদ সত্ত্বেও নাবি ﷺ-এর সাহাবি ও ফিক্হশাস্ত্রের প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সৃষ্ট মতপার্থক্যকে আমরা কীভাবে দেখব সেটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সাহাবিগণের মধ্যে যেসব মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও অনিবার্য। মূলত তাঁদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণের পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়েছিল। এই বিষয়টি কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস্ প্রসঙ্গে তাঁদের দেওয়া ব্যাখ্যার মধ্যেও ফুটে উঠেছে। তাছাড়া যেসব কারণে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলোই পরবর্তীকালে দূর হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাদীসের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে কোনো একক সাহাবির পক্ষে সব হাদীস্ জানা প্রায় একেবারেই অসম্ভব। এ কারণে তাঁরা হয়তো না জেনে কখনও কোনো ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তবে বিশুদ্ধ তথ্য কিংবা অধিকতর প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমাণ তাঁদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তাঁরা সাথে সাথে নিজেদের মত সংশোধন করে নিতেন। তাই এসব অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তাঁদের দোষারোপ করা যাবে না। বস্তুত, ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বেঁচে থাকা ও সত্য অনুসরণের এ সদিচ্ছাই তাঁদের পারস্পরিক যৌক্তিক ও স্বাভাবিক মতপার্থক্যকে ঘৃণ্য মতবিরোধিতা ও দলাদলি থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"যদি কোন বিচারক সর্বাত্মক চেষ্টা করে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে, তাহলে সে পাবে দুটি পুরস্কার; তবে যদি চেষ্টা করার পর ভুল করে তবুও সে একটি পুরস্কার লাভ করবে।"(১২)

এ হাদীসের ভিত্তিতে সহাবিগণকে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রদানের দোষ থেকে মুক্ত মনে করা হয়। তবে তাঁদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে আপাতদৃশ্য পার্থক্যগুলোকে সমর্থন করা ও চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া মোটেই উচিত নয়। কারণ তাঁরা নিজেরাই মতপার্থক্যকে অপছন্দ করতেন। ইমাম শাফি'ই-র ছাত্র আল-মুযানি থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত বর্ণনায় এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এক টুকরো কাপড় পরিধান করে সলাত আদায়ের ব্যাপারে সহাবি উবাই ইব্‌ন কা'ব এবং ইব্‌ন মাস'উদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। উবাই মনে করেন, এটি করা বৈধ। অন্যদিকে ইব্‌ন মাস'উদ ﷺ মনে করেন, কাপড়ের সংকট থাকলেই কেবল এটি করা যাবে। 'উমার ইব্‌ন আল-খাত্তাব ﷺ তাদের এ মতপার্থক্য দেখে বেশ রেগে গেলেন। রাগান্বিতভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘোষণা করেলেন, "আল্লাহর রসূলের দুজন সহাবি মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। অথচ তারা এমন সম্মানিত ব্যক্তি যাদেরকে সাধারণ মানুষ অনুসরণ করে। উবাইয়ের মত সঠিক, আর ইব্‌ন মাস'উদের নিবৃত্ত হওয়া উচিত! আমি যদি এরপর কাউকে এ বিষয়ে বিতর্ক করতে শুনি তাহলে আমি নিজেই তার মোকাবিলা করব।"(১৩)

প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞগণ সহাবিগণের মতপার্থক্যের কারণ ও লোকদের মধ্যে সেগুলোকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা সহাবিগণের মতপার্থক্য থেকে উদ্ভূত দলাদলি ও গোঁড়ামিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মতামতগুলোর অল্প কিছু নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো।

ইমাম মালিকের অন্যতম প্রধান ছাত্র ইব্‌ন আল-কাসিম বলেন, "আমি ইমাম মালিক ও আল-লাইস্‌ উভয়কে সহাবিগণের মতপার্থক্যের ব্যাপারে নিমোক্ত মন্তব্য করতে শুনেছি: 'লোকেরা বলে, এই মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে

---

(১২) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন আল-'আস্‌ কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন বুখারি, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪২, হাদীস্‌ নং ৬৬৭ ও মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৩০, হাদীস্‌ নং ৪২৬১।
(১৩) জামি' বায়ান আল-'ইল্‌ম, খণ্ড ২, পৃ. ৮৩–৮৪।

তাঁদের জন্য যেকোনো মত বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু বিষয়টি একেবারেই তা নয়; বরং সিদ্ধান্তটি হয়তো সঠিক ছিল না হয় ভুল।'''[১৪]

ইমাম মালিকের আর একজন ছাত্র আশহাব ইমাম মালিককে প্রশ্ন করেছিলেন, "নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে শোনা সাহাবিগণের যেকোনো মত অনুসরণ করা কি নিরাপদ? তিনি জবাব দিলেন, 'না, আল্লাহর কসম, সিদ্ধান্তটি সঠিক না হলে তা অনুসরণ করা নিরাপদ নয়। সত্য কেবল একটি। দুটি পরস্পরবিরোধী মতামত কি একই সময়ে সঠিক হতে পারে? সঠিক মত কেবল একটিই হতে পারে।'''[১৫]

ইমাম শাফি'ই-র ছাত্র আল-মুযানি বলেছেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবিগণের মাঝে বিভিন্ন সময়ে মতপার্থক্য হয়েছে এবং তাঁরা অনেক সময় একে অপরের মতকে ভুলও আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের একে অন্যের মতামত যাচাই করে দেখেছেন। তাঁরা যদি মনে করতেন যে, তাঁরা যা-ই বলেছেন তা সবই সঠিক তাহলে তাঁরা একে অপরের বক্তব্য পর্যালোচনা করতেন না কিংবা, একে অপরের মতকে ভুল বলেও আখ্যায়িত করতেন না।"

আল-মুযানি আরও বলেছেন, "অনেকে বলে, ইজতিহাদের ভিত্তিতে দুজন বিশেষজ্ঞের যদি একজন মত দেন এটি বৈধ, আর অপরজন মত দেন এটি অবৈধ—তাহলে তাঁরা উভয়ই সঠিক", যে ব্যক্তি এমন কথা বলে মতবিরোধকে প্রশ্রয় দেয় তাঁকে প্রশ্ন করা উচিত—"আপনি কি মৌলিক উৎস তথা কুর'আন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে এ রায় দিচ্ছেন নাকি কিয়াসের ভিত্তিতে?" যদি সে দাবি করে যে, এটি মৌলিক উৎসের ভিত্তিতে, তাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা উচিত—"এটি কেমন করে মৌলিক উৎসের ভিত্তিতে হতে পারে যখন কুর'আন নিজেই মতবিরোধের নিন্দা করে?" যদি সে দাবি করে যে, এটি কিয়াসের ভিত্তিতে, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত—"মৌলিক উৎস যেখানে মতবিরোধকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে

(১৪) প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮১–৮২।
(১৫) প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ৮২, ৮৮, ৮৯।

তা থেকেই এমন বিষয় অনুমোদনের কি়য়াস করেছেন?" বিশেষজ্ঞ তো দূরের কথা, কোনো সাধারণ ব্যক্তিও তা মেনে নেবে না।"(১৬)

যদিও সহাবিগণ কতিপয় মূলনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে তাঁরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, অন্ধভাবে মাযহাব আঁকড়ে থাকা পরবর্তীকালের 'আলিম ও অনুসারীদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এমনকি, এক পর্যায়ে তাঁদের মতবিরোধ ইসলামের অন্যতম প্রধান ভিত্তি সলাতেও তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে মাযহাবের অতি রক্ষণশীল বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে সীমার বাইরে চলে গিয়েছেন। তাঁরা এমন সিদ্ধান্তও প্রদান করেছেন যা ইসলামের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের একেবারে অন্তঃস্থলে আঘাত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম দিকের ইমামদের মধ্যে কেবল ইমাম আবু হানীফাই মনে করতেন যে, ঈমান কমেও না বাড়েও না। কোনো ব্যক্তি হয় বিশ্বাসী নতুবা অবিশ্বাসী।(১৭) আবু হানীফাহ্‌র এ মতের ভিত্তিতে হানাফি মাযহাবের পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণ একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনি কি একজন বিশ্বাসী?" তাহলে তার জন্য এ উত্তর দেওয়া নিষিদ্ধ যে, "ইন শা'আল্লাহ, আমি একজন বিশ্বাসী", কারণ এতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে তার ঈমানের

---

(১৬) প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

(১৭) এ মতটি কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ ﷻ সত্যিকারের বিশ্বাসীদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো, তা শুনে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেলো এবং তারা বললো, আমাদের জন্য আল্লাহ ﷻ যথেষ্ট এবং তিনিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক।" (সূরা 'আলি 'ইমরান, ৩:১৭৩)। অন্যত্র আছে, "সত্যিকার বিশ্বাসী তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের বিশ্বাস বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের প্রভুর ওপর ভরসা করে।" (সূরা আল-আনফাল, ৮:২)। নাবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ বিশ্বাসী হবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তাঁর সন্তানাদি, পিতা ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো।" এখানে না-বোধক বক্তব্য দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা লাভ না করা বোঝানো হচ্ছে, একেবারে ঈমানহীন হয়ে যাওয়া বোঝানো হয়নি; নতুবা আমাদের অধিকাংশকেই মু'মিন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এ হাদীসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম সংগ্রহ করেছেন। বুখারি খণ্ড ১, পৃ. ২০, হাদীস্ নং ১৪; মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৩১, হাদীস্ নং ৭১।

অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দিহান।[১৮] অন্যদিকে বিশেষজ্ঞদের ইজমা' অনুযায়ী নিজের ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ অবিশ্বাস করার (কুফ্‌র) সমতুল্য। অতএব, উত্তর দেওয়া উচিত, "আমি অবশ্যই একজন বিশ্বাসী"।[১৯] এ সিদ্ধান্তের প্রচ্ছন্ন অর্থ গ্রহণ করা হলো এই যে, অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীবৃন্দ তাদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান; অর্থাৎ তারা কুফরে লিপ্ত। হানাফি মাযহাবের প্রথম দিকের কোনো বিশেষজ্ঞই এধরনের কথা কখনো বলেননি। কিন্তু এই মতের ভিত্তিতে পরবর্তীকালের কিছু 'আলিম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের জন্য তৎকালীন দ্বিতীয় প্রধান মাযহাব তথা শাফি'ই মাযহাবের অনুসারীদের বিয়ে করা নিষেধ। হানাফি মাযহাবের পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ এ সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন।[২০] তবে তা দলাদলির এক বিভীষিকাময় ইতিহাস হিসেবে আজও রয়ে গেছে।

---

(১৮) এ ধরনের যুক্তি হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। কেননা, 'আ'ইশাহ থেকে বর্ণিত যে, নাবি ﷺ আমাদেরকে কবরস্থানে পাঠের জন্য নিম্নোক্ত দু'আ শিখিয়েছেন: "মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ ﷻ আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। আর ইনশা'আল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে শীঘ্রই মিলিত হতে যাচ্ছি।" সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৯১৯-৯২০, হাদীস্ নং ৩২৩১। নাবি ﷺ মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চয়ই সন্দিহান ছিলেন না, অথচ তিনি এক্ষেত্রে ইনশা'আল্লাহ বলেছেন।

(১৯) ইব্‌ন আবি আল-'ইয্‌য, শারহ্ আল-'আকীদাহ আত্-তাহাউইয়্যাহ, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২), পৃ. ৩৯৫-৩৯৭।

(২০) নতুন এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন "মুফতী আস্-সাকালাইন" হিসেবে খ্যাত হানাফি বিশেষজ্ঞ যিনি খ্রিষ্টান ও ইহুদি মহিলাদের বিয়ের অনুমতির ভিত্তিতে শাফি'ই মহিলাদের বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মিশরীয় হানাফি বিশেষজ্ঞ, যাইন আদ-দীন ইব্‌ন নুজাইমের আল বাহ্‌র আর-রা'ইক নামক গ্রন্থে এমনটি বলা হয়েছে। তবে, এ সিদ্ধান্তে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজও হানাফি মহিলাদের জন্য খ্রিষ্টান ও ইহুদি পুরুষদের ন্যায় শাফি'ই পুরুষদেরকে বিয়ে করা বৈধ নয়!

অধ্যায় সারাংশ

১. সাধারণ মুসলিমদের বদ্ধমূল ধারণা হলো, চারটি মায্হাবের সকল সিদ্ধান্তই নির্ভুল। প্রত্যেকের জন্য এগুলোর যেকোনো একটির অনুসরণ বাধ্যতামূলক। কোনো অনুসারী নিজ মায্হাব পরিবর্তন করতে পারবে না। এমনকি নিজ মায্হাব ছাড়া অন্য কোনো মায্হাবের কোনো সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে পারবে না।[২১]

২. যে ব্যক্তি মায্হাবগুলোকে নির্ভুল মনে করে না কিংবা চার মায্হাবের কোনো একটিরও অনুসরণ করে না, তাকে একজন বিদ'আতি হিসেবে আখ্যায়িত করে "ওয়াহাবি" কিংবা "আহলে হাদিস" নামে ডাকা হয়।

৩. মায্হাবি দলাদলিকে সমর্থনের লক্ষ্যে হাদীসের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে বা অনির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. কুর'আন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিমদের মধ্যকার সংঘাত ও মতবিরোধের নিন্দা করে।

৫. হাদীস ব্যাখ্যার যোগ্যতা ও হাদীসের জ্ঞানের তারতম্যের কারণে সহাবিদের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ হয়েছে। তাঁদের মতের বিপক্ষে সুন্নাহ থেকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেলে সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত মত পরিত্যাগ করতেন।

---

(২১) *Madh-hab of the Convert* শিরোনামে *Taqleed & Ijtihād* গ্রন্থের লেখক লিখেছেন: "যে অঞ্চলে যে মায্হাব প্রভাবশালী, সে অঞ্চলের লোকেরা ঐ মায্হাবেরই অনুসরণ করবে। তবে যদি কোনো অঞ্চলে একাধিক মায্হাব প্রায় সমভাবে প্রচলিত থাকে, তাহলে সে যেকোনো মায্হাব বেছে নিতে পারে। তবে, একবার বেছে নিলে সে-মায্হাব থেকে বের হওয়ার আর কোনো সুযোগ তার থাকবে না।" (পৃ. ১৩)।

৬ প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন যে, সময় পরিক্রমায় সাহাবিগণের যে সিদ্ধান্তগুলো সঠিক প্রমাণিত হয়ে এসেছে কেবল সেগুলোই অনুসরণযোগ্য।

৭ সাহাবিগণের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো কখনো তাঁদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভাজন সৃষ্টি করেনি। পক্ষান্তরে, মাযহাবগুলোর পরবর্তী পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক অনৈ-ক্যের জন্ম দিয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি যে, মাযহাবগুলো মূলত চারটি মৌলিক পর্যায় অতিক্রম করেছে। নেপথ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত কারণগুলো:

১. ঐক্যবদ্ধ বা বিশৃঙ্খল বিভিন্ন অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি

২. দীনি নেতৃত্বের অবস্থা (একীভূত ও রক্ষণশীল, বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষণশীল)

৩. বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যোগাযোগ।

প্রাথমিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্রটি ছিল তুলনামূলকভাবে ঐক্যবদ্ধ। তখন নেতৃত্বও ছিল একীভূত এবং শাসকগণ ছিলেন ধর্মপরায়ণ। সে সময় মুসলিম বিশেষজ্ঞগণও একে অপরের কাছাকাছি ছিলেন। ফলে তখন যোগাযোগ ছিল অনেক সহজ। এ কারণেই তখন কেবল একটি মাযহাবই বিদ্যমান ছিল; আর তা ছিল নাবি ﷺ-এর মাযহাব অথবা ন্যায়নিষ্ঠ চার খলীফার মাযহাব। তারপর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙন ধরে। শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিবাস স্থাপন করেন। যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতার কারণে বিশেষজ্ঞগণ পারস্পরিক পরামর্শের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে বাধ্য হন।

এভাবে একসময় গড়ে উঠে অসংখ্য মাযহাব। তবে অধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসভিত্তিক অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের মত পরিত্যাগে এই বিশেষজ্ঞগণ মোটেও দ্বিধা করতেন না। ফলে তারা পূর্ববর্তী যুগের বিশেষজ্ঞদের উদার মানসিকতার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'আব্বাসি খিলাফাতের শেষের দিকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষজ্ঞগণও

অনেকটা জড়িয়ে পড়েন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত দরবারি বিতর্ক এ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়। এই অবাঞ্ছিত বিতর্কে বিজয়ী ব্যক্তি ও তাদের মাযহাবকে বিশেষ রাজকীয় আনুকূল্য এনে দেয়। মূলত এটি ছিল গোঁড়ামিপূর্ণ দলাদলিরই আরেকটি ধাপ। আর এর মাধ্যমে বিদ্যমান চারটি মাযহাবের অনুসারীদের অনেকেই ব্যক্তিগত সুখ্যাতি লাভ করেছেন।

গতিশীল ফিকহ

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা মূলত পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোরই একটি সংমিশ্রণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি পুনরায় মুসলিম 'আলিমদের পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এর বহু আগেই মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক সরকার পদ্ধতির ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তাবাদী সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। পরিণতিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দুই বিলিয়ন। কেবল আল্লাহ ﷻ ও তাঁর নাবি ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাসই এই বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটি অন্যরকম ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র চার মাযহাবের যেকোনো একটি দিয়ে ধর্মীয় শাসনতন্ত্রের আইন পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টা পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম গোঁড়া। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখানেও মাযহাবকেন্দ্রিক দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে এখনও রয়ে গিয়েছে। এ কারণেই শাসনতন্ত্রের এই ব্যবস্থাও মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিভেদ সৃষ্টি করছে।

তবে এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর দীনকে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী শক্তি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের মধ্যে একটি আশাব্যঞ্জক প্রেরণা জেগে উঠেছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু সংস্কৃতি বিদ্যমান। উপরন্তু, দ্রুত পরিবর্তনশীল এ বিশ্বে প্রাত্যহিক জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যা ও বিষয়াবলি ক্রমবর্ধমান হারে বৈচিত্র্য লাভ করছে। ফলে অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন থেকে উপলব্ধি করছেন যে, কেবল গতিশীল-ফিকহ-চর্চার-ধারা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমেই মুসলিমদের

জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এ বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বেও "বিকাশ পর্যায়" শিরোনামে উল্লেখ করেছি। সব ধরনের গোঁড়ামি ও দলীয় চিন্তা দূরীভূত করে মাযহাবগুলোর পুনরায় একত্রীকরণ এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রকে গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে ইজতিহাদের দ্বার পুনরায় খুলে দেওয়া আবশ্যক। এতে করে মুসলিম আইনজ্ঞগণ এমন বস্তুনিষ্ঠ আইন প্রণয়নে সক্ষম হবেন যেগুলো দিয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভিন্নতা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শারী'আহ আইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

এরূপ সংস্কারের সম্ভাব্য প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেবল ইসলামে নবদীক্ষিত লোকদের উপরই নয় বরং মুসলিম হিসেবে জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্মের উপরও এর প্রভাব পড়বে। নতুন ইসলাম গ্রহণকারীরা বিভিন্ন মাযহাবের মতপার্থক্যের জটিলতা থেকে রেহাই পাবে। আর মুসলিম সমাজে জন্ম নেওয়া মুসলিমদের নতুন প্রজন্ম মাযহাবগুলোর মতপার্থক্যের কারণে সৃষ্ট হতাশা থেকে মুক্তি পাবে। তখন তাঁরা সকল মাযহাব ও প্রথম যুগের বিশেষজ্ঞদের অসাধারণ অবদানকে বর্জন করার অদূরদর্শী চিন্তাধারাও পরিহার করতে পারবে।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ

একটি কার্যকর মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ মাযহাব, একটি কার্যকর সংস্থা এবং একটি প্রাণবন্ত ফিক্‌হশাস্ত্র প্রয়োজন। এর মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি সম্মিলিতভাবে মানবজাতির সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামি জীবনব্যবস্থার বাস্তবমুখিতা তুলে ধরবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাযহাবগুলোর পুনরেকত্রীকরণ ও একটি গতিশীল ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই অনস্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হলো, এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে? প্রথমত, প্রথম যুগের মহান ইমাম ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মাযহাবগুলোর বর্তমান অবস্থার সাথে এর প্রধান বিশেষজ্ঞদের অবস্থানের যে ব্যাপক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা বাস্তবসম্মত উপায়ে দূর করতে হবে।

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে যোগ্য নেতৃত্বের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনে উৎসাহী ও উদ্যমী ব্যক্তিবর্গকে এ লক্ষ্যে অন্যান্য আগ্রহী পক্ষের সাথে যোগাযোগ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। সমস্যা নিরসনের এসব পদক্ষেপের মধ্যে থাকবে:

১. সমাধানের নেপথ্য প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা,

২. সর্বাধিক উপযোগী সমাধান নির্বাচন,

৩. বাস্তবায়নের সম্ভাব্য পন্থা নির্ধারণ,

৪. সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি নির্বাচন, এবং

৫. সমাধান বাস্তবায়ন।

এ ধরনের পরিকল্পনার প্রত্যেকটি স্তরে পদক্ষেপগুলোকে বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তাত্ত্বিক পর্যায়ে মায্‌হাবগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন মতপার্থক্য নিরসনের পরামর্শ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে এটা একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, গতিশীল ফিক্‌হশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ও মায্‌হাবগুলোর পুনরেকত্রীকরণের এ কাজ মোটেই কোনো সহজসাধ্য বিষয় নয়। তবে কষ্টসাধ্য হলেও তা নিশ্চয়ই সম্ভব। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রথম যুগের ইমামদের প্রণীত পদ্ধতিভিত্তিক নিম্নোক্ত কাঠামোটি বিভিন্ন সময়ে অনেক উদার মানসিকতার বিশেষজ্ঞগণ অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বহুমুখী ও বিপরীতমুখী মতপার্থক্য

মায্‌হাবগুলোর মতপার্থক্যগুলো প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত, বহুমুখী মতপার্থক্য বা ইখতিলাফ তানাওউ'। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে 'আলিমদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত থাকলেও এগুলোর বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য এবং এদের সহাবস্থানও সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, স্বলাতে নাবি

ﷺ-এর বিভিন্নভাবে বসার পদ্ধতি। হয়তো একটি বসার ধরনকে একটি মাযহাব অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

বেশ কিছু বিষয়ে কুর'আন, সুন্নাহ ও সাহাবিগণের ইজমা' কিংবা কিয়াস সমর্থিত একাধিক সমাধান রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্তগুলোকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার উপযোগী বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। আর এগুলো হচ্ছে উল্লিখিত যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য মতপার্থক্যের একটি অংশ। এই ধরনের বিষয়কে দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিরোধের উৎসে পরিণত করা একেবারেই অনুচিত। কারণ, সকল বর্ণনাই স্বয়ং নাবি ﷺ-এর কাছ থেকে এসেছে।

দ্বিতীয়ত, পরস্পর বিপরীতমুখী মতপার্থক্য বা ইখতিলাফ তাদাদ। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে এমন বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত দেখা যায়, যার সবগুলো যৌক্তিকভাবে একই সময়ে সঠিক হতে পারে না। যেমন, কিছু জিনিষকে এক মাযহাব হয়তো হালাল ঘোষণা করছে, আর অপর মাযহাব তাকে হারাম সাব্যস্ত করছে। এই ধরনের মতপার্থক্য নিরসনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত:

১. শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণগত ব্যাখ্যার ভিন্নতার কারণে উদ্ভূত অধিকাংশ মতপার্থক্য নিরসনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীস অনুসরণ করতে হবে। হাদীসকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে উক্ত শব্দটির বাঞ্ছিত অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অর্থকে অন্য সব ব্যাখ্যার উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

২. একইভাবে হাদীসভিত্তিক নয় কিংবা দুর্বল তথা অনির্ভরযোগ্য হাদীসের ভিত্তিতে দেওয়া আইনগত সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করে নির্ভরযোগ্য হাদীসের ভিত্তিতে দেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

৩. বিতর্কিত মূলনীতি কিংবা কিয়াসের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজমা'র আলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। তারপর এগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ও অসংগতিপূর্ণগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

মাযহাবগুলোর মতপার্থক্য নিরসনের এই তাত্ত্বিক রূপরেখা ফিক্‌হ শাস্ত্রের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নে নিবেদিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিক কার্যকর। এধরনের শিক্ষাকেন্দ্র হলো এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে কোনো মাযহাবকেই অন্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না; বরং কোনো বিষয়কে গ্রহণ বা বর্জনের একমাত্র মানদণ্ড হবে বিশুদ্ধ দলিল । এ অবস্থায় ইসলামি আইনকে এর মূল উৎস থেকে অধ্যয়ন করা যাবে এবং বিভিন্ন মাযহাবের মতকে যৌক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার মান উন্নত হলে, মাযহাবগুলো পুনরেকত্রীতকরণের মহৎ পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত সাফল্যের প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করা যাবে। দলীয় চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি ঐক্যবদ্ধ মাযহাবই মুসলিম বিশ্বের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্বের ধারাবাহিকতাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। একই সাথে বিশ্বব্যাপী শারী'আহ আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনগুলোকেও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। মাযহাবগুলোর একীভূত করা ও ইসলামি আইনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সফলতা এলে, আমরা তখন উম্মাহর পুনরেকত্রীকরণ ও সত্যিকারের খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দিতে পারব। আল্লাহ ﷻ চাইলে এ উদ্যোগ বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ভিত্তি ও দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ‘আবদুল্লাহ ইব্ন আয-যুবাইর

খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন মু‘আউইয়াহর শাসনামলের (৬০—৬৪ হিজরি; ৬৮০-৬৮৩ সাল) শেষ দিকে ‘আবদুল্লাহ ইব্ন আয-যুবাইরকে হিজায অঞ্চলের খলীফা ঘোষণা করা হয়। হিজাযের এ বিদ্রোহের কথা জানতে পেরে ইয়াযীদ তা দমন করার জন্য তার সেনাপতি মুসলিম ইব্ন ‘উকবাহ্‌র নেতৃত্বে একদল সৈনিক প্রেরণ করেন। ৬৪ হিজরিতে (৬৮৩ সাল) খলীফার প্রেরিত সেই সেনাবাহিনী মাক্কা যাওয়ার পথে মাদীনায় ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। তবে মাক্কা পৌঁছার পূর্বে তাদের বাহিনী প্রধান মারা যায় এবং হুসাইন ইব্ন নুমাইর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়।

এ সেনাবাহিনী পবিত্র মাক্কা নগরী অবরোধ করে ও শহরের চারপাশে পাহাড়ের উপর ভারী প্রস্তর নিক্ষেপক কামান স্থাপন করে। এমনকি বৃষ্টির মতো তাঁদের এ পাথর নিক্ষেপের কারণে কা‘বার দেওয়ালের কিয়দংশ ভেঙে পড়ে এবং কা‘বার কালো পাথরে (হাজ্‌র আসওয়াদ) ফাটল ধরে। তবে অবরোধকালে ইয়াযীদের মৃত্যু হওয়ায় উমাইয়া সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তারপর উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে ইব্ন আয-যুবাইরের বিদ্রোহে ইরাকিরাও একাত্মতা ঘোষণা করে। ইব্ন আয-যুবাইরের ভাই মুস‘আবকে ইরাকের আমীর নিয়োগ করা হয়। তার অল্প কিছুদিন পর দক্ষিণ আরব, মিশর ও সিরিয়ার কিছু অংশও খলীফা ইব্ন আয-যুবাইরের সাথে যোগ দেয় এবং তার নেতৃত্বকে সুসংহত করার জন্য তাকে মাক্কা ছাড়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ইব্ন আয-যুবাইর পবিত্র মাক্কা নগরী ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম (৬৪—৬৫ হিজরি; ৬৮৩—৬৮৫ সাল) উমাইয়া খিলাফাতের দায়িত্ব নেওয়ার পর দামাস্কাস ও সিরিয়াকে আবারও

উমাইয়া শাসনের অধীনে নিয়ে আসে। মারওয়ানের পুত্র 'আবদুল-মালিকের (৬৫–৮৬ হিজরি; ৬৮৫–৭০৫ সাল) শাসনামলের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিজায ছিল খলীফা ইব্‌ন আয-যুবাইরের শাসনাধীন। পরিশেষে 'আবদুল-মালিক তার লৌহহস্ত সেনাপতি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের নেতৃত্বে একটি বিশাল সিরীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। তারা হিজাযের উপর সর্বশেষ আঘাত হানে।

৭২ হিজরির ১ জুল-কাদা (২৫ মার্চ ৬৯২ সাল) থেকে হাজ্জাজ সাড়ে ছয় মাসের জন্য মাক্কা অবরোধ করে রাখে। আবু বাক্‌রের কন্যা ও 'আ'ইশাহ এর বোন আসমা ছিলেন ইব্‌ন আয-যুবাইরের মা। তার বীরোচিত উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইব্‌ন আয-যুবাইর শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বীর বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যান। তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দামাস্কাস পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং দেহটি প্রকাশ্য স্থানে কিছু সময় ঝুলিয়ে রাখার পর তার বৃদ্ধ মা'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইব্‌ন আয-যুবাইরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রথম যুগের সর্বশেষ বীরপুরুষদের একজনের বিদায় ঘটে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব উমাইয়াদের লৌহমুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

পরিশিষ্ট খ: কিছু বিপথগামী উপদল

খাওয়ারিজ

(একবচনে খারিজি; আক্ষরিক অর্থ বিচ্ছিন্নতাবাদী)। এরা ছিল মূলত খলীফা 'আলি ইব্‌ন আবি তালিবের সেনাবাহিনীরই একটি অংশ। ৩৭ হিজরিতে (৬৫৭ সাল) 'আলি ও মু'আউইয়াহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) ইব্‌ন আবি সুফ্‌য়ান এর মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খিলাফাহকে কেন্দ্র করে 'আলি ও মু'আউইয়াহর মধ্যকার ভুল বোঝাবোঝি এক পর্যায়ে যুদ্ধের রূপ নেয়। এই যুদ্ধের সময়ই এই ফিরকা 'আলির সেনাবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে যখন দুপক্ষের মধ্যে সালিশ অনুষ্ঠিত হলো তখন 'আলি ﵁-এর অনুসারীদের একটি বিশাল অংশ প্রধানত তামীম গোত্রের লোকেরা সালিশের বিরোধিতা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যায় এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব রাসিবীকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। তারা 'আলি ও মু'আউইয়াহ উভয়কে কাফির ঘোষণা করে। কারণ তাদের মতে, তারা উভয়ে ওয়াহ্‌য়ির আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত ফায়সালা বাদ দিয়ে মানবীয় সালিশের আশ্রয় নিয়েছেন। যারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়নি এবং 'আলি ও মু'আউইয়াহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এমন প্রত্যেককে তারা কাফির আখ্যায়িত করেছে।

খাওয়ারিজদের মতে সকল বিচার ফয়সালা সরাসরি কুর'আন থেকে আসা উচিত। তারা তাদের এ অবস্থানের বিরোধিতাকারী যেকোনো মুসলিমের রক্তপাত ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাকে বৈধ মনে করত। খাওয়ারিজরা অন্য মুসলিমকে বিয়ে করা ও তাদের থেকে উত্তরাধিকার লাভ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে ব্যক্তি ব্যভিচার, মিথ্যাচার, নেশাগ্রহণ ইত্যাদি কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় সে একজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)।

তাদের চরমপন্থী শাখা আজরাকীদের ধারণা অনুযায়ী, এভাবে যে একবার কাফির হয়েছে সে কখনো ঈমানে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবে না; তাকে তার স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ হত্যা করতে হবে। খলীফা 'আলি ﵁ বাধ্য হয়ে তাদের শিবিরে আক্রমণ করেন ও তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ৩৭ হিজরির (৬৫৭ সাল) সে আক্রমণে ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ও তার অধিকাংশ অনুসারী নিহত হয়। এটি নাহরাওয়ানের যুদ্ধ নামে পরিচিত। তবে এ বিজয়ের বিনিময়ে 'আলি ﵁-কে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। বিদ্রোহ দমন হওয়া তো দূরের কথা, এর ফলে বরং পরের দুবছরে আরও বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। আবদুর-রহ্‌মান ইব্‌ন মুলযিম নামক এক খারিজির ছুরিকাঘাতে 'আলি ﵁ নিহত হন। মুলযিম ছিল এমন এক মহিলার স্বামী যার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

মু'তাযিলা

একটি দার্শনিক মতবাদ, এটি সাধারণত যুক্তিবাদ নামে পরিচিত। হিজরি দ্বিতীয় শতকে ওয়াসিল ইব্‌ন 'আতা' ও 'আম্‌র ইব্‌ন 'উবাইদ এ মতবাদটি প্রচার শুরু করেন। পরবর্তীকালে 'আব্বাসি শাসকরা এ দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে

প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এমনকি তৎকালীন সকল বিশেষজ্ঞকে এ মতবাদ মেনে চলতে বাধ্য করার লক্ষ্যে একটি সরকারি তদন্ত বাহিনী তৈরি করা হয়। অবশ্য খলীফা মুতাওয়াক্কিল (৫৭২–৫৮৮ হিজরি; ১১৭৭–১১৯২ সাল) মতবাদটি পরিত্যাগ করেন এবং এ তদন্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন। এদের উল্লেখযোগ্য বিচ্যুত আকীদাগুলো হলো: আল্লাহ ﷻ সর্বত্র বিরাজমান, কুর'আন একটি সৃষ্ট বস্তু এবং তার অর্থগুলোই কেবল ঐশী, জান্নাতি লোকেরা আল্লাহকে দেখবে না, ঐশী হস্তক্ষেপ ছাড়াই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি রয়েছে এবং কাবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থানে চলে যায়।

শী'আহ

(বাংলায় এদের শিয়া বলা হয়)। ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আউইয়াহর শাসনামলের শুরুতে চতুর্থ খলীফা 'আলি ইব্‌ন আবি ত্বালিবের পুত্র হুসাইন ؓ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'আলি ইব্‌ন আবি ত্বালিবের ইরাকি অনুসারীরা তাকে ইরাকে এসে নেতৃত্ব দেওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়। তবে পরবর্তীকালে তারা তাকে পরিত্যাগ করে এবং এর পরিণতিতে কারবালায় ইয়াযীদের সৈনিকদের হাতে (৬১ হিজরি; ৬৮০ সাল) তিনি শাহাদাত বরণ করেন। 'আলি ؓ-এর অনুসারীদের অনেকেই এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ইসলামের মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। 'আলি ؓ-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও তাঁর বিরোধীদের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশে তারা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের ধারণা প্রথম তিন খলীফা আবু বাক্‌র, 'উমার ও 'উস্‌মান, 'আলির কাছ থেকে ইমামের পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তাদেরকে এরা প্রথমে জবরদখলকারী ও পরে কাফির বলে আখ্যায়িত করে। প্রথম তিন খলীফার খিলাফআহকে মেনে নেওয়ার কারণে নাবি ﷺ-এর সকল সাহাবিকে মুরতাদ ঘোষণা করা হয়। কেবল সালমান আল-ফারিসি, আবু যার আল-গিফারি ও মিকদাদ ইব্‌ন আল-আসওয়াদ কিন্দিকে এ গুরুতর অভিযোগ থেকে ছাড় দেওয়া হয়। অবশ্য কিছু কিছু বর্ণনায় আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। কারণ তাদের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, তারা নাবি ﷺ-এর মৃত্যুর পর 'আলির খিলাফাহ লাভের অধিকারকে ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিলেন। এ দাবির সমর্থনে কিছু জাল হাদীস্ উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব জাল হাদীসের

ভিত্তিতে দাবি করা হয় যে, নাবি ﷺ তাঁর সকল সাহাবিদের কাছ থেকে এই মর্মে আনুগত্যের একটি শপথ পাঠ করিয়েছিলেন, নাবি ﷺ-এর মৃত্যুর পর 'আলীই হবেন তাদের নেতা। তাদের ধারণা অনুযায়ী, ১০ম হিজরীর জুল-হিজ্জাহ মাসের ১৮ তারিখে বিদায় হাজ্জের পর মাক্কা থেকে মাদীনায় ফেরার পথে গাদীর খুম নামক স্থানে এ শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা আরও দাবি করে যে, 'আলি ও নাবি কন্যা ফাতিমার বংশধরদের কয়েকজনই কেবল মুসলিম উম্মাহর ইমাম হওয়ার অধিকার রাখতেন। এমনকি তারা যাদেরকে ইমাম উপাধি দিয়েছে তাদের প্রতি তারা আল্লাহর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যও আরোপ করেছে। তাদেরকে আল্লাহর নবীদের চেয়েও উপরে স্থান দিয়েছে। এসব বিশ্বাসকে আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনি নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

"ইমামের রয়েছে একটি সম্মানিত অবস্থান, একটি সমুন্নত পদমর্যাদা এবং একটি সৃষ্টিশীল প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফাহ। তার সার্বভৌমত্ব ও রাজত্বের সামনে মহাবিশ্বের সকল পরমাণু আনুগত্য করে। আর আমাদের (শী'আহ) মাযহাবের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হলো, ইমামদের এমন একটি স্থান রয়েছে যেখানে কোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতা কিংবা কোনো নবীও পৌঁছাতে পারেন না। অধিকন্তু আমাদের নিকট যেসব বর্ণনা ও হাদীস রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে জানা যায় যে, এ পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ নাবি মুহাম্মাদ ﷺ ও বারো জন ইমাম আলো আকারে বিদ্যমান ছিলেন। তাদের দিয়ে আল্লাহ পাক তাঁর সিংহাসন পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলেন।"

তবে প্রত্যেক নতুন ইমামের পদবি অনুসারে তাদের মধ্যে নতুন শী'আহ উপদল সৃষ্টি হয়েছে। তারা নতুন ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এসব কারণে ঐতিহাসিকভাবেই শী'আহদের দলাদলির প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। তারা বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস লালন করত। উল্লেখ্য যে, ইসলামের মূল ধারা থেকে ছিটকে পড়া বিদ'আতি উপদলগুলোর অধিকাংশই কোনো না কোনো শী'আহ ফিরকা থেকে জন্ম নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নুসাইরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নুসাইরি উপদলটি ২৪০ হিজরিতে (৮৫৫ সাল) দাবি করেছিল যে, 'আলি ﷺ ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর আত্মপ্রকাশ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আদ-দুরযির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উপদলটি দাবি করেছিল যে, মিশরের ফাতিমি শী'আহ খলীফা হাকিম বিআমরিল্লাহ (৩৫৫-

৪১১ হিজরি; ৯৬৬-১০২১ সাল) ছিলেন মানবাকৃতিতে আল্লাহর সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ। আর নুবুওয়াতের দাবিদার 'আলি মুহাম্মাদ রিদা ও তার শিষ্য হুসাইন 'আলি (বাহাউল্লাহ) বাহাই নামের উপদলটি প্রতিষ্ঠা করে যে নিজেকে প্রতীক্ষিত ঈসা ও আল্লাহর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দাবি করেছিল।

পরিশিষ্ট ৩ : ফিক্‌হশাস্ত্রের কিছু পরিভাষা

উর্‌ফ

কোনো বিশেষ এলাকা বা জনগোষ্ঠীর সাধারণ যেসব প্রথা বা ঐতিহ্য ইসলামি আইনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেগুলোই 'উর্‌ফ। ইসলামি আইনের কোনো মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক না-হলে স্থানীয় প্রথা ইসলামি আইনের একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিয়ের স্থানীয় প্রথা। ইসলামের বিধান অনুসারে, বিবাহ সম্পাদনের অংশ হিসেবে দেনমোহর অবশ্যই সুনির্ধারিত হতে হবে। তবে তা পরিশোধের জন্য কোনো সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়নি। মিশরীয় ও অন্য কিছু অঞ্চলের প্রথা হলো যে, মুকাদ্দাম নামে এর একটি অংশ বিয়ের সময় প্রদান করতে হবে। আর বাকিটুকু কেবল মৃত্যু কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় দিতে হবে। একে বলা হয় মু'আখ্‌খার।

'উর্‌ফ-এর আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাড়া দেওয়া-নেওয়া সংক্রান্ত বিচিত্র নিয়মনীতির মধ্যে। ইসলামি আইন অনুযায়ী বিক্রিত পণ্য সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এটি একটি প্রচলিত নিয়ম যে, ভাড়ার স্থান বা বস্তু নির্দিষ্ট সময় ধরে ব্যবহৃত হওয়ার আগেই ভাড়া পরিশোধ করা হয়। 'উর্‌ফ-এর আরেকটি উদাহরণ হলো, সিরিয়া অঞ্চলে দাব্বাহ শব্দের প্রচলিত অর্থ। সেখানে দাব্বাহ শব্দ দ্বারা ঘোড়াকে বোঝানো হয়। অথচ আরবিতে এর স্বাভাবিক অর্থ হলো যেকোনো চতুষ্পদ জন্তু। অতএব, সিরিয়াতে সম্পাদিত কোনো চুক্তিতে কোনো কিছু দাব্বাহ আকারে পরিশোধের শর্ত

দেওয়া হলে তার সঠিক অর্থ হবে ঘোড়া। পক্ষান্তরে, আরব বিশ্বের অন্যত্র এটিকে অধিকতর স্পষ্টতার সাথে ঘোড়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

ইসতিহ্সান (আক্ষরিক অর্থ: প্রাধান্য)

ইসতিহ্সান হলো পরিস্থিতির জন্য অধিকতর উপযোগী হওয়ার কারণে একটি প্রমাণকে আরেকটি প্রমাণের উপর প্রাধান্য দেওয়া। হতে পারে যে, প্রাধান্য দানকৃত প্রমাণটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। এটি হতে পারে একটি 'আম বা সাধারণ হাদীসের উপর একটি খাস বা সুনির্দিষ্ট হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। কিংবা হতে পারে কিয়াসের মাধ্যমে গৃহীত আইনের উপর অধিকতর উপযোগী অন্য কোনো আইনকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। কোনো পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়সংক্রান্ত চুক্তির আলোচনায় ইসতিহ্সান নীতির অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। নাবি ﷺ বলেছেন,

> "কেউ যেন নিজ অধিকারে না আসা পর্যন্ত কোনো খাদ্যদ্রব্য বিক্রি না করে।"

কিয়াস ও এই হাদীস অনুযায়ী উৎপাদনকারীর সাথে পণ্য ক্রয়ের সকল অগ্রিম চুক্তি অবৈধ। কারণ চুক্তির সময় এক্ষেত্রে পণ্যটির কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে, লোকেরা এ ধরনের চুক্তি সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করে নেওয়ায় এবং এ ধরনের চুক্তির প্রয়োজন সুস্পষ্ট হওয়ায় কিয়াসভিত্তিক সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে ইসতিহ্সান নীতির ভিত্তিতে এগুলোকে বৈধ করা হয়েছে।

ইসতিস্হাব (আক্ষরিক অর্থ: সংযোগ অনুসন্ধান)

কোনো অবস্থাকে ইতিপূর্বে সংঘটিত কোনো অবস্থার সাথে সংযোগ করে ফিক্হি আইন বের করে আনার প্রক্রিয়া। এ নীতির ভিত্তি হলো যে, বিশেষ অবস্থাতে প্রযোজ্য ফিক্হি আইন ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ থাকে যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারও দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে তার জীবিত থাকা কিংবা মৃত্যুবরণ করার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে এখনো জীবিত থাকলে যেসব নীতি প্রযোজ্য হতো ইসতিস্হাব নীতির ভিত্তিতে সেসবই বলবৎ থাকবে।

ইসতিস্‌লাহ্‌ (আক্ষরিক অর্থ: কল্যাণ অনুসন্ধান)

ইমাম আবু হানীফাহ্‌র উদ্ভাবিত ইসতিহ্‌সান নীতি ইমাম মালিক ও তাঁর ছাত্রবৃন্দও আরও নিয়ন্ত্রিতভাবে ইসতিস্‌লাহ্‌ নামে প্রয়োগ করেছেন। এর সরল অর্থ হলো, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অধিক উপযোগী কোনো পন্থা অবলম্বন করা। এতে এমন কিছু বিষয় আলোচিত হয় যা শারী'আহতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলেও তার বৃহত্তর মানবকল্যাণ নীতির মধ্যে তা নিহিত রয়েছে।

খলীফা 'আলি ﷺ-এর একটি সিদ্ধান্তে ইসতিস্‌লাহ্‌-এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তটি ছিল এই যে, সংঘবদ্ধ হত্যাকারী চক্রের প্রত্যেক সদস্যকেই হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে, যদিও প্রকৃত হত্যাকাণ্ডটি মাত্র একজন সংঘটিত করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে শারী'আহ আইনে কেবল প্রকৃত হত্যাকারীর কথাই বলা হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ হলো, রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে ধনী মানুষের কাছ থেকে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য কর আদায় করার ব্যাপারে একজন মুসলিম শাসকের অধিকার। অথচ শারী'আহতে কেবল যাকাতকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্বিয়াসের মাধ্যমে উৎসারিত আইনের তুলনায় মানবকল্যাণের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ইমাম মালিক ইসতিস্‌লাহ্‌ নীতি প্রয়োগ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

‘আক্ল	عقل	বহুবচনে ‘উকূল; আক্ষরিক অর্থ মন বা বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধি-বিবেক যাকে ভালো কিংবা মন্দ মনে করে তার ভিত্তিতে ইসলামি আইন নির্ধারণের প্রক্রিয়া।
‘আব্বাসি	عباسی	মুসলিম খলীফাদের দ্বিতীয় প্রধান রাজবংশ। এর সূচনা খলীফা আবু আল-‘আব্বাস সাফফাহ (১৩২–১৩৬ হিজরি; ৭৫০–৭৫৪ সাল) এর ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে এবং পরিসমাপ্তি মঙ্গোলদের হাতে খলীফা আল-মুসতা‘সিমের (৬৩৯–৬৫৫ হিজরি; ১২৪২–১২৫৮ সাল) নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে।
‘উলামা’	علماء	একবচনে ‘আলিম; আক্ষরিক অর্থ জ্ঞানী। তবে এ পরিভাষাটি দিয়ে সাধারণত ইসলামি বিশেষজ্ঞদের বোঝানো হয়।
উম্মাহ	أمة	বহুবচনে উমাম; আক্ষরিক অর্থ জাতি। তবে এ পরিভাষাটি সাধারণত গোটা মুসলিম জাতিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যা কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা কিংবা কোনো বর্ণ বা ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।
আদাব	آداب	একবচনে আদাব; ইসলামি শিষ্টাচার।

উদু’	وضوء	পবিত্রতার একটি অবস্থা যা বিশেষ ধরনের কিছু ইবাদাতের পূর্বশর্ত। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কনুই পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল ধোয়া, মাথা মাসেহ করা এবং গোড়ালি পর্যন্ত উভয় পা ধোয়া।
উমাওয়ি	أموي	মুসলিম খলীফাদের প্রথম প্রধান রাজবংশ যার সূচনা খলীফা মু‘আউইয়াহ্‌র (৪১ হিজরি; ৬৬১ সাল) ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে এবং পরিসমাপ্তি খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের (১২৬–১৩২ হিজরি; ৭৪৪–৭৫০ সাল) নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে।
আসার	أثر	বহুবচনে আসার; সাহাবি ও তাঁদের ছাত্রদের বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত।
আহ্‌লুর-রা’ই	أهل الرأي	আক্ষরিক অর্থ মতামতের জনগোষ্ঠী। প্রথম দিকের কিছু বিশেষজ্ঞকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কারণ তাঁরা নাবি ﷺ-এর কথা ও কার্যাবলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় যুক্তি ব্যবহার করতেন।
আহ্‌লুল-হাদীস	أهل الحديث	আক্ষরিক অর্থ হাদীসের অনুসারী। প্রথম দিকের সেসব বিশেষজ্ঞকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছিল যারা মাত্রাতিরিক্ত যুক্তিপ্রদর্শন এড়িয়ে নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ্‌র আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতেন। বর্তমান সময়ে ভারত ও পাকিস্তানে এটি একটি নেতিবাচক পরিভাষা হিসেবে মাযহাব বিরোধীদের জন্য ব্যবহার করা হয়।
ইজতিহাদ	إجتهاد	বহুবচনে ইজতিহাদাত। ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি আইন বের করার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া।
ইজমা‘	إجماع	ইসলামি আইনের কোনো বিষয়ে সাহাবি কিংবা মুসলিম বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।
ইত্তিবা‘	إتباع	গোঁড়ামি ছেড়ে জ্ঞান ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মাযহাবের অনুসরণ।

ইমাম	إمام	বহুবচনে আ'ইম্মাহ। আক্ষরিক অর্থ নেতা, তবে ইসলামি পরিভাষায় এ শব্দটি দ্বারা শাসক বা জাম্'আহ সলাতে নেতৃত্ব দানকারী কিংবা অসাধারণ ইসলামি জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়।
ঈমান	إيمان	আক্ষরিক অর্থ বিশ্বাস; ইসলামের সঠিক বিশ্বাস।
উসূল	أصول	একবচনে আসল; যেকোনো জ্ঞানের মৌলিক নীতিমালা। যেমন, উসূল আল-ফিক্হ পরিভাষাটি দ্বারা কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াস নামক ইসলামি আইনের উৎসগুলোকে বোঝায়।
কাদি	قاضي	বহুবচনে কুদাত; বিচারক।
কায্যাব	كذّاب	আক্ষরিক অর্থ চরম মিথ্যুক; হাদীসশাস্ত্রে এ নামটি হাদীসের এমন বর্ণনাকারীকে দেওয়া হয় যার মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস জানা।
কিয়াস	قياس	যৌক্তিক পদ্ধতিতে ইসলামি আইন উৎসারণ। সাদৃশ্যপূর্ণ পরিস্থিতির ভিত্তিতে পূর্বের আইন থেকে নতুন আইন বের করে আনা হয়।
কুর্'	قرء	বহুবচনে কুরূ'; মহিলাদের ঋতুস্রাব অথবা দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময়।
খাম্র	خمر	আক্ষরিক অর্থ আঙুরের গাজানো রস। ইসলামি আইনে এ পরিভাষাটি দ্বারা সব ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্যকে বোঝানো হয়।
খলীফা	خليفة	বহুবচনে খুলাফা'; আক্ষরিক অর্থ উত্তরাধিকারী। নাবি ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবু বাক্র ছিলেন প্রথম খলীফা। পরবর্তী সময়ে এটি সকল মুসলিম শাসকদের উপাধিতে পরিণত হয়।
জানাবাহ	جنابة	দৈহিক মিলন কিংবা স্বপ্নদোষের ফলে অপবিত্রতা।

জাম্‘আ	جمع	হাদীস্ শাস্ত্রে দুটি আপাত সংঘাতপূর্ণ হাদীসের অর্থসমূহ এমনভাবে সমন্বয় করা যাতে একটি অপরটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করে।
জিহাদ	جهاد	আক্ষরিক অর্থ সংগ্রাম; ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। তবে, ইসলামি পরিভাষায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।
জাহির	ظاهر	বহুবচনে জাওয়াহির। কুর'আন কিংবা হাদীসের পাঠের সুস্পষ্ট আক্ষরিক অর্থ।
যাকাত	زكاة	এক প্রকার বাধ্যতামূলক দান যা বছরে একবার প্রত্যেক মুসলিমের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে ইসলামি রাষ্ট্র আদায় করে। উক্ত সম্পদ কমপক্ষে একবছর তার অধিকারে থাকতে হবে এবং তার পরিমাণ সাড়ে ৫২ ভরি রূপার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।
তাওহীদ	توحيد	আল্লাহর একত্বের বিশুদ্ধ ধারণা। এটি কেবল ইসলামেই পাওয়া যায়, যেখানে আল্লাহকে তাঁর সত্ত্বা, গুণ ও ক্ষমতার দিক দিয়ে অনন্যরূপে এক ও একক মনে করা হয়।
তাওয়াস্সুল	توسّل	আল্লাহর নিকট প্রার্থনার সময় কোনো মধ্যস্থতাকারীর হস্তক্ষেপ কামনা করা।
তাক্ওয়া	تقوى	আল্লাহ যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা করা ও যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করার মাধ্যমে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।
তাকলীদ	تقليد	কোনো বিশেষ মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ।
তাফসীর	تفسير	কুর'আনের আয়াতের অর্থের ব্যাখ্যা।
তাবি‘উন	تابعون	একবচনে তাবি‘ই; আক্ষরিক অর্থ অনুসারী। যারা সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তারজীহ্	ترجيح	অধিকতর নির্ভরযোগ্যতার কারণে হাদীসের একটি বর্ণনা অথবা বিশেষজ্ঞের কোনো একটি বক্তব্যকে একই বিষয়ের অন্য বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া।
তলাক়	طلاق	বিবাহ বিচ্ছেদ; ইসলামে দুধরনের তলাক় রয়েছে। *তলাক় রাজ'ই,* যেক্ষেত্রে স্ত্রীকে নতুন বিয়ে ছাড়াই আবার ফিরিয়ে আনা যায়। আর *তলাক় বাইন,* যেক্ষেত্রে মহিলাটিকে ফিরিয়ে আনা যায় না, যতক্ষণ না সে অন্য কাউকে বিয়ে করে এবং পুনরায় তলাক়প্রাপ্তা হয়।
তাস্হীহ্	تصحيح	মাযহাবের বিশেষজ্ঞদের দেওয়া বক্তব্যের বিশুদ্ধতা যাচাই সাপেক্ষে শ্রেণিবিন্যাস করা কিংবা হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করা।
তাহারাহ	طهارة	ইসলামি শারী'আহ্র নির্দেশনা অনুযায়ী অর্জিত পরিচ্ছন্নতা, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়মে দেহ, বস্ত্র ও 'ইবাদাতের স্থানের পরিশুদ্ধি।
তায়াম্মুম	تيمّم	পানি না পাওয়া কিংবা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন।
দু'আ'	دعاء	বহুবচনে আদ'ইয়াহ। অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা, যার কোনো নির্দিষ্ট ধরন বা সময়সীমা নেই; আবেদন।
দ'ঈফ	ضعيف	আক্ষরিক অর্থ দুর্বল। হাদীস শাস্ত্রে এর অর্থ হলো এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর ত্রুটি কিংবা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার কারণে কম নির্ভরযোগ্য হাদীস।
নাহ্ও	نحو	ব্যাকরণ।
ফাসিক়	فاسق	যে মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বারবার ইসলামি আইন লঙ্ঘন করে।
ফাতওয়া	فتوى	বহুবচনে ফাতাওয়া; দীনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আইনি সিদ্ধান্ত।

ফিক্‌হ	فقه	শারী'আহ্‌র যথাযথ উপলব্ধি ও সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ; ইসলামি আইনতত্ত্ব।
ফুরূ'	فروع	একবচনে ফার'। প্রাথমিক মূলনীতিগুলো থেকে উৎসারিত ইসলামি আইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের নীতিমালা।
বাই'	بيع	ব্যবসায় চুক্তি।
বিদ'আহ	بِدعة	দীনি 'ইবাদাহ বা আকীদাহ্‌তে নতুন সংযোজন।
মুকাদ্দাম	مقدّم	দেনমোহরের অংশবিশেষ যা বিভিন্ন দেশের স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সময় কনেকে প্রদান করা হয়।
মাযহাব	مذهب	বহুবচনে মাযাহিব। আইনি কিংবা দার্শনিক মতবাদ।
মাশহূর	مشهور	আক্ষরিক অর্থ বিখ্যাত। হাদীস শাস্ত্রে এ পরিভাষাটি দ্বারা নাবি ﷺ-এর সেসব কথা ও কাজকে বুঝায় যা বিভিন্ন উৎস থেকে অসংখ্য লোক থেকে বর্ণিত হওয়ার সুবাদে সুপরিচিত।
মাসজিদ	مسجد	বহুবচনে মাসাজিদ; সলাত আদায়ের নির্ধারিত ঘর।
মুনাযারাত	مناظرات	একবচনে মুনাযারাহ; ইসলামের আইনি বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যকার বিতর্ক।
মুফতি	مفتي	ইসলামের আইনের সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম বিশেষজ্ঞ।
মুরসাল	مرسل	সহাবিদের কোনো ছাত্র থেকে নাবি ﷺ-এর প্রতি আরোপিত হাদীস্ যেখানে বর্ণনাকারী সাহাবির নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
মুস্তাহাব	مستحب	খুবই প্রশংসনীয় কাজ যা করা হলে পুরস্কার রয়েছে, কিন্তু না করলে কোনো শাস্তি নেই। সুন্নাহ নামেও পরিচিত।

মু'আখ্খার	مؤخّر	কোনো কোনো অঞ্চলের স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী দেনমোহরের যে অংশ স্বামীর মৃত্যু কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় স্ত্রীকে প্রদান করা হয়।
শির্ক	شرك	আল্লাহর গুণাবলি কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া কিংবা সৃষ্টির কোনো গুণাবলী আল্লাহকে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।
শূরা	شورىٰ	পারস্পরিক পরামর্শ বা পরামর্শমূলক সংস্থা।
সওম	صوم	সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয়, দৈহিক মিলন ও সমস্ত অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকা। একে সিয়ামও বলা হয়।
সলাত	صلاة / صلاوٰة	বহুবচনে সলাওয়াত। দাঁড়ানো, রুকূ', বসা ও সাজদাহ সংবলিত মুসলিমদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাহ।
সাহাবাহ	صحابة	একবচনে সাহাবি। যিনি মুসলিম অবস্থায় নাবি ﷺ-কে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে ইন্তেকাল করেছেন; সহচর।
সহীহ্	صحيح	আক্ষরিক অর্থ নির্ভুল। হাদীস্ শাস্ত্রে এ পরিভাষাটি দ্বারা এমন হাদীসকে বোঝানো হয়, যেখানে বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্য ধারাবাহিকতা রয়েছে; অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং যেখানে প্রত্যেক বর্ণনাকারীই ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে পরিচিত।
সুজূদ	سجود	সলাতের সময় মাটিতে কপাল লাগানো।

সুন্নাহ	سنّة	নাবি ﷺ-এর জীবন পদ্ধতি, অর্থাৎ তাঁর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি। হ়াদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনায় নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ পাওয়া যায়। প্রচলিত অর্থে সুন্নাহ শব্দটি ফার্দ় (ফরজ) কিংবা ওয়াজিবের বাইরে পছন্দনীয় কোনো কাজকে বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়।
সুন্নি	سنّي	যে ব্যক্তি নাবি ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে, অর্থাৎ ইসলামের যথাযথ কিংবা মূল স্রোতের অনুসারী। বিভিন্ন বিচ্যুত উপদল ও ইসলামের বিশুদ্ধ ধারার অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সাধারণত এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে সুন্নি নামধারী কিছু চরম বিদ'আতী ফিরকারও অস্তিত্ব দেখা যায়।
হ়াজ্জ	حجّ	নির্দিষ্ট 'ইবাদাহ পালনের লক্ষ্যে জুল-হ়িজ্জাহ মাসের ৮–১২/১৩ তারিখে মাক্কায় অবস্থিত কা'বাহর উদ্দেশ্যে গমন। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম সুস্থ দেহ ও মস্তিস্কের অধিকারী সব প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর এটি একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।
হ়াদীস়	حديث	বহুবচনে আহ়াদীস়। নাবি ﷺ-এর কথা, কাজ বা মৌনসম্মতি।
হ়ারাম	حرام	নিষিদ্ধ কর্ম ও বস্তুসমূহের আইনগত শ্রেণিভূক্তির নাম।
হ়ালাল	حلال	অনুমোদিত শ্রেণিভুক্ত কাজকর্ম ও বস্তুসমূহের আইনগত নাম।
হ়িজায	حجاز	আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল; মাক্কা ও মাদীনাহ শহর এর অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

আয্-যাহাবি, মুহাম্মাদ হুসাইন, আশ-শারী'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ, (মিশর: দার আল- কুতুব আল-হাদীসাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৮)।

আত-তুর্কি, 'আবদুল্লাহ 'আবদুল-মুহসিন, আসবাব ইখতিলাফ আল-ফুকাহা, (রিয়াদ: আস সা'আদাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৪)।

আদ-দাহ্লাউই, ওয়ালীউল্লাহ, আল-ইনসাফ ফী বায়ান আসবাব আল-ইখতিলাফ, (বৈরুত: দার আন-নাফা'ইস, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮)।

আন-নাওয়াউই, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শারাফ আদ-দীন, আল মাজমু' শারহ্ আল-মুহাজ্জাব, (কায়রো: ইদারাহ আত্-তাবা'আহ আল-মুনীরিয়্যাহ, ১৯২৫)।

আবু যাহরাহ, মুহাম্মাদ, তারীখ আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ, (কায়রো: দার আল-ফিক্‌র আল-'আরাবি)।

আল-আ'জামি, মুস্তাফা, সাহীহ্ ইব্‌ন খুযাইমাহ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮)

আল-আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, দা'ঈফ আল-জামি'ই আস্-সাগীর, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৯)

———, ইরওয়া আল-গালীল, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯)

———, সাহীহ্ সুনানি আবি দাউদ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮)

———, সিফাহ সলাত আন-নাবি, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ৯ম সংস্করণ, ১৯৭২)

———, সিলসিলাহ আহাদীস্ আদ্-দা'ঈফাহ ওয়াল-মাওদু'আহ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭২)

আল-কাত্তান, মান্না', মাবাহিস্ ফী 'উলূম আল-কুর'আন, (রিয়াদ: মাকতাব আল-মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

———, আত-তাশরী' ওয়াল ফিক্‌হ ফী আল-ইসলাম, (মিশর: মাকতাব ওয়াহবাহ, মাতবা'আহ তাকদ্দাম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬)।

আল-খাতীব আল-বাগদাদী, আহ্মাদ ইব্‌ন 'আলি, আল-কিফায়াহ ফী 'ইল্‌ম আর-রিওয়ায়াহ, (কায়রো: দার আল- কুতুব আল-হাদীসাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২)।

আল-জাবুরী, 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ, ফিক্হ আল-ইমাম আল-আওযা'ই, (বাগদাদ, ইরাক: মাতবা'আতুল ইরশাদ, ১৯৭৭)।

আল-ফুলানী, সালিহ ইব্ন মুহাম্মাদ, ঈকাজ হিমাম উলিল-আবসার লিল-ইকতিদা বি সায়্যিদি আল-মুহাজিরিন ওয়াল-আনসার, (কায়রো: আল মুনীরিয়্যাহ প্রেস, ১৯৩৫)।

আশ-শাক'আহ, মুসতাফা, আল-আ'ইম্মাহ আল-আরবা'আহ, (কায়রো: দার আল-কিতাব আল-মিসরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯)।

———, আল-ফাওয়া'ইদ আল-মাজমু'আহ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২)।

আশ-শাওকানি, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলি, নাইল আল-আওতার, (মিশর: আল হালাবী প্রেস, ১ম সংস্করণ)।

ইব্ন 'আবিদীন, মুহাম্মাদ ফাহীম, হাশিয়াহ ইব্ন 'আবিদীন, (কায়রো: আল মুনীরিয়্যাহ প্রেস, ১৮৩৩-১৯০০)।

ইব্ন 'আব্দিল-বার্র, ইউসুফ ইব্ন 'উমার, জামি' বায়ান আল-'ইল্ম, (কায়রো: আল মুনীরিয়্যাহ প্রেস, ১৯২৭)।

———, আল ইন্তিকা ফী ফাদাইলিস সলাসাতিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা, (কায়রো: মাকতাবুল কুদসী, ১৯৩১)।

ইব্ন 'আসাকির, 'আলি ইব্ন আল-হারান, তারীখ দিমিশ্ক আল-কাবীর, (দামেশক: রওদাতুশ শাম, ১৯১১-১৯৩২)।

ইব্ন আবি 'ইয্য, শারহ আল-'আকীদাহ আত-তাহাউইয়্যাহ, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)।

ইব্ন আবি হাতিম, 'আব্দুর-রাহমান ইব্ন মুহাম্মাদ, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, (হায়দ্রাবাদ, ভারত: মাজলিসু দাইরাহ মা'আরিফি আল-উসমানিয়্যাহ: ১৯৫২)।

ইব্ন আল-কায়্যিম, মুহাম্মাদ ইব্ন আবি বাক্র, ই'লাম আল-মুকি'ঈন, (মিশর: আল-হাজ্জ 'আব্দুস-সালাম প্রেস, ১৯৮৮)।

ইব্ন আল-জাওযি, 'আব্দুর-রাহমান ইব্ন আল-জাওযী, মানাকিব আল-ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবাল, (বৈরুত: দার আল-আফাক আল-জাদীদাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৭)।

ইব্ন ইরাক, 'আলি, তানযীহ আশ-শারী'আহ আল-মারফূ'আহ, (বৈরুত, আল কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯)।

ইব্ন তাইমিয়্যাহ, আহমাদ ইব্ন 'আব্দুল-হালীম, রাফ'উল-মালাম 'আন-আল আ'ইম্মাহ আল-আ'লাম, (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭০)।

ইব্ন মু'ঈন, ইয়াহ্ইয়া, আত-তারীখ, (মাক্কাহ: কিং 'আবদুল-আযীয ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৯)।

ইব্ন রুশদ, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ, বিদায়াহ আল-মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াহ আল-মুক্তাসিদ, (মিশর: আল মাকতাবাহ আত-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা)।

কাদরী, আনওয়ার আহ্মাদ, ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ইন দ্যা মডার্ন ওয়ার্ল্ড, (লাহোর, পাকিস্তান: আশরাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩)।

ক্রেমার্স, জে এইচ এন্ড বিল, এইচ এ আর, শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, (ইথাকা, নিউ ইয়র্ক: কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩)।

খোমিনি, আয়াতুল্লাহ, আল হুকূমাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, (তেহরান, ১৯৬৯), আরবি সংস্করণ।

বেক, মুহাম্মাদ আল-খিদ্‌রী, তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামি, (কায়রো: আল মাকতাবাহ আত-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৯৬০)।

মূসা, মুহাম্মাদ ইউসুফ, মুহাদারাত ফী তারিখ আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামি, (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-'আরাবি, ১৯৫৫)।

রাহীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ, ট্র্যান্সলেশন অব আল-মুয়াত্তা' ইমাম মালিক, (নিউ দিল্লি: কিতাব ভবন, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

শালাবি, মুহাম্মাদ মুস্তাফা, উসুল আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামি, (বৈরুত: লেবানন: দার আন-নাহ্দাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮)।

———, আল-মাদখাল ফী আত-তা'রীফি বিল-ফিক্‌হ আল-ইসলামি, (বৈরুত, দার আন-নাহ্দাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৯)।

শেরওয়ানি, মাওলানা মুহাম্মাদ মাসীহুল্লাহ খান, তাক্লীদ এন্ড ইজতিহাদ, (পোর্ট এলিজাবেথ, দক্ষিণ আফ্রিকা: দ্যা মাজলিস, ১৯৮০)।

সাবিক্, আস-সায়্যিদ, ফিক্‌হ আস-সুন্নাহ, (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-'আরাবি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৭)।

স্ট্রযিযেওস্কা, বোযিনা গাজানি, তারীখ আত-তাশরী' আল-ইসলামি, (বৈরুত: লেবানন: দার আল-আফাক আল-জাদীদাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০)।

হাস্সান, হাস্সান ইবরাহীম, ইসলাম: এ রিলিজিয়াস পলিটিকাল, স্যোশাল এন্ড ইকোনোমিক স্টাডি, (ইরাক: ইউনিভার্সিটি অব বাগদাদ প্রেস, ১৯৬৭)।

মাযহাবঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বইটিতে লেখক ফিক্‌হশাস্ত্র ও মাযহাবের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। মাযহাব আবির্ভাবের মূল কারণ এবং মাযহাবগুলোর মধ্যে মতপার্থক্যের অন্তর্নিহিত কারণ আলোকপাত করা হয়েছে। মাযহাব যাদের জন্য এক ধাঁধার বিষয়, বইটির এই দিকটি তাদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে নিঃসন্দেহে। ফিক্‌হকেন্দ্রিক মতপার্থক্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করা হলেও বইটির মূল বার্তা মুসলিম উম্মাহর একত্রীকরণের প্রস্তাবনা।

"বইটি যে-কারণে কৌতুহলের দাবিদার সেটা হচ্ছে লেখক আবু আমীনাহ মাযহাব সম্পর্কে যেসব মর্মভেদী গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন... মুসলিমদের মধ্যে আত্মসমালোচনার বিষয়টি অনেক দিন ধরেই হারিয়ে গিয়েছিল। সেদিক থেকে বইটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি পুনরায় আত্মসমালোচনার দ্বার খুলে দিয়েছে।"

ড. আবদুর রাহমান দোই, মুসলিম ওয়ার্লড বুক রিভিউ, খণ্ড-১০, নং-৪, ১৯৯০

"বইটিতে লেখক বিষয়বস্তু এত আকর্ষণীয় ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন যে এক বসায় শেষ না করে আমি আর উঠতে পারিনি।"

এম.এম. আবদুল কাদের, সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারক, শ্রীলঙ্কা

ISBN 9789843376763

www.sean-publication.com